KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৩০৯, বহুবাজার স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher :
Title : বঙ্গদর্শন	Size : 7"x9" 17.78x22.86 c.m.
Vol. & Number : 1/6	Year of Publication : অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ ॥ Nov 1931
	Condition : Brittle / Good
Editor : বিপিনচন্দ্র বিদ্যানন্দ	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

[১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা] SWADESH NOVEMBER, 1931 [অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

স্বদেশ

সম্পাদক : শ্রীবৈদ্যনাথ বিশ্বাস

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

নাগপুর পাইওনিয়ার ইন্‌সিওরেন্স কোং, লিঃ

[হেড আফিস—নাগপুর]

এই স্বদেশী কোম্পানীতে জীবন-বীমা করিয়া আপনার আর্থিক সংস্থানের সহিত স্বদেশের কল্যাণ সাধন করুন। শুধু স্বদেশী প্রতিষ্ঠান বলিয়াই আমরা আপনাদের সহযোগিতার দাবী করি না। উৎকৃষ্ট জীবন-বীমা আফিসগুলির মধ্যে "নাগপুর পাইওনিয়ার" অন্যতম।

এ, কে, সেন এণ্ড সন্‌

চীফ এজেন্টস্, বেঙ্গল, আসাম ও বর্ম্মা।

কলিকাতা অফিস
২৫ নং বিডন ষ্ট্রীট।

রেঙ্গুন অফিস
৬২ নং ফেয়ার ষ্ট্রীট।

বার্ষিকমূল্য সডাক ৩৲] কার্য্যালয় :—৩০৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন—কলি ১৬০২ [প্রতি সংখ্যা ।০ আনা

কলিকাতা সোপের সাবান—

বিলাতীকেও হার মানিয়েছে !

কয়েকটি সুপরিচিত "ক্যালসো"
সাবানের নাম।

চন্দন, ডালি, বেলা, কামিনী, প্রতিমা
হেনা, খস্, কেতকী, বকুল,
ভায়লেট ও মালতী

—ইত্যাদি—ইত্যাদি—

গায়ে মাখিতে ও কাপড় কাচিতে ভারত প্রসিদ্ধ

"নির্ম্মলিন"

কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্
ভারতের বৃহত্তম সাবানের কারখানা
বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল্ ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ

ভারতের গৌরব ! ১৯০৮ সালে স্থাপিত !

ভারতীয় পরিচালনায় অবিমিশ্র ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। কোনও 'ভ্যালুয়েশনে'ই কোনদিন ঘাটতি (ডিফিসিট্) না পড়াই ইহার বিশেষত্ব।

ইহার সূচনার তারিখ হইতেই বীমাকারীগণ প্রতি বৎসরই অপ্রতিহতভাবে লভ্যাংশ (বোনাস্) উপভোগ করিয়া আসিতেছেন। ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের ভ্যালুয়েশন অসামান্য সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে।

জীবন বীমা ফণ্ডের প্রতি শতটাকায় ১৫৲ টাকা লাভ (সারপ্লাস) দেখা গিয়াছে। ১৯২৯ সালে লভ্যাংশ পাইবার যোগ্য সকল পলিসিতে হাজার করা বার্ষিক ১৫৲ হিসাবে বোনাস যোগ হইয়াছে, উদ্বৃত্তের এক তৃতীয়াংশেরও অধিক ভবিষ্যৎ বোনাস রিজার্ভ ফণ্ডে মজুত রাখা হইয়াছে।

এজেন্সি, বাৎসরিক হিসাব নিকাশের রিপোর্ট ও ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট পাইবার জন্য আবেদন করুন। সেক্রেটারী

১০২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

১ম বর্ষ | অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসন্ন্যাসী সাধুখাঁ

প্রথম যৌবন-দিন দিয়াছিল অপরূপ ভুবনের অপূর্ব্ব ইঙ্গিত।
একদা শুনিনু সেথা ঋষিকুমারের কণ্ঠে ব্যথাময় সন্ধ্যার সঙ্গীত।
বয়সে তরুণ অতি ; দুটি চোখে স্বপনের মায়া।
তবু দুই তীর ঘেরি পড়িয়াছে সকরুণ ছায়া।
অন্তহীন মরণের ; পরপারে কিছু নাই, শুধু তার কালো যবনিকা।
'সব চ'লে যায়' হায় ! আঁধার মরণ-কোলে এ জীবন ক্ষণ দীপশিখা।

দুঃখেরে নিবিড় করি' বারে বারে বুকে ধরি' কবি চায় জুড়াইতে জ্বালা।
নিজে কাঁদি প্রেয়সীরে শিখাইল কাঁদিবারে—গাঁথিবারে নয়নাশ্রুমালা।
তবু তো মানে না মন ! শান্তি নাই নিরাশার গানে।
ত্রিযামা যামিনী মাঝে ভ্রমে কবি আলোর সন্ধানে।
গূঢ় অন্ধকার তলে সৃষ্টির বিকাশ লাগি' পাতি-পাতি খুঁজে সর্ব্ব ঠাঁই।
আপনার দীর্ঘশ্বাসে আপনি চমকি উঠে, প্রতিধ্বনি বলে,—নাই নাই।

সহসা হৃদয়-দল স্পর্শভরে টলমল, কেমনে যে তা'রা গেল খুলি ;
প্রভাত-আলোকে দেখে সারাটি জগত আসি' সেইখানে করে কোলাকুলি।
আছে রে জীবন আছে অন্ধকার মরণের পার ;
এত আলো এত প্রাণ এত যে আনন্দ-গান তা'র—
সবারে সে চায় বুকে, তাই অকারণ সুখে এঁকে যায় জগতের ছবি।
মধুর আলস ভরে সন্ধ্যায় দুপুরে প্রাতে নিজ মনে গান গায় কবি।

প্রিয়ারে চাপিয়া বুকে পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালার মতন
কহে কানে,—কাঁদে প্রাণ তোমার দেহের তরে, মুক্ত কর সর্ব্ব আবরণ।
পুড়ে যাই লাজ মুক্ত বাস-মুক্ত মিলন-শ্মশানে ;
অসীম সুন্দররূপে ফুটে উঠি দুটি নগ্ন-প্রাণে।
হায় ভুল, কোথা প্রাণ ! দেহ শুধু হাতে আসে এই ক্ষুদ্র সীমার বন্ধনে।
প্রিয়ার নয়নে চাহি' 'নিখিল-নির্ভর' লাগি' ভরে মন আকুল-ক্রন্দনে।

মিলন যে দাবানল ! বিরহ মধুর হ'ল, কবি তাই হয়েছে উদাসী।
বিজন দেউলে বসি' দূর বিরহের মাঝে শুনেছে কি মিলনের বাঁশী ?
ত্রিভুবন দূরে ফেলি' সৃষ্টিছাড়া এ কি আরাধনা !
আকাশের চাঁদ লাগি কাঁদা তাই সাঙ্গ হইল না।...
একদা বিষম ঝড়ে বজ্র আসি' পড়ে ঘরে, দেউল ভাঙিয়া একাকার !
জীবনের খুটিনাটি সৃষ্টির আনন্দগানে কলহাস্যে ভরে চারিধার।

এতদিনে বুঝিল সে স্রষ্টা নয় সৃষ্টিছাড়া ; তাই এই বসুন্ধরা-বুকে
প্রকাণ্ড উল্লাস ভরে আপনারে ব্যাপ্ত করি' নৃত্য করি' বেড়াইল সুখে।
রসের সমুদ্র 'পরে সোণার তরীটি চলে ভাসি'—
নব নব রূপ-লোক দু-নয়নে উঠিল প্রকাশি।
পরিপূর্ণ শান্তি ল'য়ে আকণ্ঠ নিমগ্ন করি' এই বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে
অনন্ত সৌন্দর্য্য-সুধা আবেশে করিল পান, তবু মন তৃপ্তি মানে না-যে।

কভু তাই পদ্মা-জলে ভাষায়ে তরণী-খানি বসি' রয় তীর পানে চাহি'।
কভু শাল-বীথিকায় গ্রামান্তের রাঙা পথে ব্যাকুল বাউল উঠে গাহি'।
সারাটি আকাশ ভরি' একখানি কম্পমান সুর
মধ্যাহ্নের রৌদ্রকেও করি' দেয় উদাস-বিধুর।
অশোক কিংশুক আর পিয়াল-পলাশদল সঙ্গীতের ইঙ্গিতে মুঞ্জরে ;
আম্র মঞ্জরীর পাশে মধুর মদিরা-লোভী মদালস ভ্রমর গুঞ্জরে।

উদ্দাম সঙ্গীতে কভু লুব্ধ চিতে মুগ্ধ কবি অনিন্দিতা উর্ব্বশীর লাগি'
ফিরিছে বিশ্বের পথে। কখনো সন্ধ্যায় স্বপ্নে বারেকের দরশন মাগি'
যায় উজ্জয়িনীপুরে বহুদূরে শিপ্রানদী পারে,
আলিঙ্গনে বাঁধে পূর্ব্ব জনমের প্রথমা প্রিয়ারে।...
কভু ক্ষণিকের তরে কৌতুকে ফাটিয়া পড়ে উড়াইতে আপনার ব্যথা
কত হাসি-গুঞ্জরণে, কত-যে আনন্দ-গানে ; তবু তার ফুরায় না কথা।

শেষে উৎসবের দিনে জীবন-দেবতা-পদে যত শোভা যত গান প্রাণ
দলিত দ্রাক্ষার মতো নিঙাড়ি' নিঙাড়ি' বক্ষ হাসিমুখে করি' দিল দান।
স্রষ্টা যে সৃষ্টির বড়, তাই কবি সন্ধ্যাদীপ জ্বালি'
আপনারে পূর্ণ করি' সমর্পিল নৈবেদ্যের থালি।...
মুছিল তটের রেখা—শেষের খেয়ায় যায় মুগ্ধ কবি অরূপের পানে।
বাতাস বাঁধন-হারা উল্লাসে দিল-যে সাড়া কলকল কল্লোলের গানে।

কখন ঘুমের ঘোরে তরণী ঠেকিল কূলে অগোচর অতীন্দ্রিয়-লোকে।
কে যেন আসিয়াছিল, কে যেন ফিরিয়া গেছে, তা'রি ব্যথা আলোকে-আলোকে।
দর্শন মিলে না চোখে, তবু যেন তাঁরি পরশন
সঙ্গীত-ইঙ্গিতময়, সর্ব্ব অঙ্গে তুলে হরষণ।
সীমা-মাঝে অসীমের অরূপ মাধুরীখানি গন্ধে-বর্ণে উঠিছে উচ্ছলি'।
পরম আনন্দে কবি তাহারি উদ্দেশে দিল হৃদয়ের গীত-পুষ্পাঞ্জলি।

এবার হৃদয় মাঝে বিদায়ের বাঁশী বাজে কবি তাই হয়েছে উতলা।
রূপ-লোকে ফিরে দেখে—সর্ব্বনাশা প্রেমে-কা'র দলে দলে অবারণ চলা।
হংস-বলাকার পাখা ছুটিয়াছে দূর হ'তে দূরে,—
নিখিল জগত ছুটে তা'রি পিছে অজানিত পুরে।
তীরের সঞ্চয় ছাড়ি' আজি দিতে হবে পাড়ি সমুদ্রের মহা খরস্রোতে—
ব্যথার বাঁশীতে তাই বাজে ওই,—ভেসে যাই অন্ধকারে—অকূল আলোতে।

আজিকে বিদায়ক্ষণে বারম্বার পড়ে মনে স্নেহময়ী বসুন্ধরা-মা'কে।
সুনিবিড় বেদনায় শেষবার এ ধরার আলিঙ্গনে বাঁধে আপনাকে।
দোলে নয়নের জলে সেই লীলা-সঙ্গিনীর স্মৃতি,
দু-চোখে ঝলকি' ওঠে রাঙা তা'র সকরুণ সাঁথি !
ওখানেতে রাত্রি-শেষে ঝ'রে-পড়া শেফালিরা বলে,—কবি সাঙ্গ হ'ল দিন !
এখন গগনে তাই রবির পূরবী ছন্দে বাজে শেষ-রাগিণীর বীণ।

সপ্তাহ

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

দেশের মুক্তি-স্বপ্ন দেখার অপরাধে যে দিন জেলের ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুকলাম, সে-দিন বুক ত ফুলে উঠেইছিল, সেই সঙ্গে আনন্দও বড় অল্প বোধ করিনি। কিন্তু খানিক পরে যখন শুনলাম মহকুমা-সহরের এই ছোট্ট জেলখানাটিতে একান্ত স্থানাভাব, আমাদের থাকতে হবে সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে, তখন আমাদের দেশপ্রেম হঠাৎ যেন একটু সঙ্কুচিত হয়ে গেল। এ ওর মুখের দিকে চাইতে লাগল।

বঙ্কুদা বললে এ অন্যায় সে সহ্য করবে না; প্রতিবাদের জন্যে আমাদের উপোস করতে হ'বে।

উপোস করলেই যে স্রীং-এর খাট আর পালকের বিছানা আর চিনে-হোটেলের খাবার পাওয়া যাবে এ রকম আশা আমার বিশেষ ছিল না। সুতরাং উপোস ক'রে নিজের নিগ্রহ বোকামী বলেই বোধ হ'ল। ভাবলাম, মুক্তি-যুদ্ধের এই ত সবে রিহার্সাল! সামান্য খাবার শোবার অসুবিধা নিয়ে স্ত্রীলোকের মত অনুযোগ করার মত লজ্জা আর নেই; সত্যিকার লড়াইয়ে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত জোটে না। সেখানে কাণের চারিপাশ দিয়ে ছোটে গুলী, চোখের সামনে বারুদের ধোঁয়া থাকে গাঢ় হয়ে।...

আমরা তাদের তুলনায় ঢের সুখে আছি।

বঙ্কুদা ছিল আমাদের দলের অগ্রণী; তার পরামর্শ না নিলে আমাদের কাজ চলে না। সে একেবারে বেঁকে বসেচে। বললে, কষ্ট সহ্য করতে পারার কথা এখানে ওঠে না বিশু, এ হ'ল অধিকারের কথা—মানুষের অধিকারের কথা। আমরা চুরি করিনি, আমাদের হাতে রক্ত লেগে নেই।

বঙ্কুদাকে বলতে পারতাম যারা চুরি করে তাদের গায়ের চামড়াও মানুষেরই। কিন্তু তর্কের সময় বঙ্কুদার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, তাই চুপ করে রইলাম। উপরন্তু বঙ্কুদার বক্তৃতা শুনেই আমরা তিরিশটি মুক্তি-সৈনিক কারাগারকে পবিত্র করতে এসেচি!

তখন সন্ধ্যা হয়েচে। জেলখানার কুঠরীগুলির মধ্যে কেরোসিনের যে আলো জ্বালা হয়েচে, তাতে ঝুল পড়েচে এত বেশী যে ঘরগুলিকে ঘোলাটে, ভয়াবহ দেখাচ্চে। জেলখানার মাঝখানে সরু একটু উঠোন; উঠানের চারপাশে আধা-অন্ধকার ঘরের শ্রেণী এবং ঘরগুলির পেছন দিয়ে উঠেচে প্রকাণ্ড পাঁচিল—পাঁচিলের মাথায় লোহার শিক, কোথায় বা বোতলের ভাঙা কাঁচ। অস্পষ্ট আলোয় এই অপরিচিত জায়গাটিতে হঠাৎ যেন হাঁফ ধরতে লাগল। মনে হ'ল, আমাদের আগে কত লোক এখানে কত রাত্রি বাস করে গেচে; জেলখানার পুরাণ খাতায় এখনও হয়ত তাদের নাম দেখতে পাওয়া যাবে; কিন্তু এই ঘরগুলির মধ্যে একদিন তাদের বুকে যে অভিশাপ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল—মানুষের বিরুদ্ধে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, এমন কি নিজের বিরুদ্ধে ...সে সব গেছে মিলিয়ে; তাদের কারও কারও চোখের জলে হয়ত এর সিমেণ্ট করা মেঝে আরও মসৃণ হয়ে গিয়েচে—কিন্তু জেলার তার হিসেব রাখেনি।

খানিক পরেই এলেন জেলার রামগোবিন্দবাবু। রামগোবিন্দবাবুকে চিনি ছেলেবেলা থেকে—মণ্টুর বাবা উনি। মণ্টু আমাদেরই সঙ্গে পড়ত। কতদিন রামবাবুর বাড়ীতে গিয়েচি—মণ্টুর সঙ্গে অঙ্ক কষতে। রামবাবু আমাদের কত কথা জিজ্ঞাসা করতেন, কেমন মিষ্টি তাঁর কথাবার্ত্তা। সেই রামবাবু—মণ্টুর বাবার এখন কি গম্ভীর মূর্ত্তি! আমাদের কাউকেও যেন তিনি চেনেন না।

সামনে এসে বললেন, ও-দিক্‌কার লম্বা ঘরটা তোমাদের জন্যে ঠিক করা হয়েচে। সকলকে সেইখানেই শুতে হ'বে। তারপর কাল অন্য ব্যবস্থা।

অন্য ব্যবস্থাটা কি রকম হ'বে জানবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আগেই রামগোবিন্দ বাবু করলেন প্রস্থান।

উনি ত মণ্টুর বাবা ন'ন—জেলার।

রাত্তিরটা তিরিশ জনে মিলে একটা ঘরের মধ্যে কাটিয়ে দেওয়া গেল। ঘুম আর হয় নি, হয়েছিল চীৎকার। শুতে আসবার পূর্ব্বে আহার-পর্ব্বটা কি ভাবে সম্পন্ন হয়েছিল, সে কথা না বলাই নিরাপদ!

সারারাত্রি ধরে কেউ বা ভাবলে তার বাড়ীর কথা, মায়ের কথা, ছোট বোনের কথা। তারা কি ভাবচে কি জানে,—ভারতের বন্ধন-বেদনায় নয়, ছেলের, দাদার কষ্টের কথা কল্পনা ক'রে তাদের চোখেও বুঝি ঘুম আর এল না!

কেউ গান ধরেচে—অত্যন্ত সস্তা প্রেমের গান—বিরহ আর হা-হুতাশের! বীরু স্কুলের মাইনে না দিয়ে খদ্দরের কাপড় চাদর কিনেচে, বাবা জান্‌তে পেলে কি করবেন ভেবে বেচারী অজীর্ণতা রোগে পড়বার চেষ্টা করচে। বাবা তার মুন্সিফ।

রাতের অন্ধকারে, এই স্বল্প পরিচিত ঘরখানির মধ্যে আমরা তখন আর ভারতের মুক্তি-ভিক্ষু স্বেচ্ছাসৈনিক নই, ভয়, লোভ, লালসা দিয়ে গড়া ছোটখাট মানুষ!

অতিকষ্টে রাতের আয়ু এক সময়ে ফুরিয়ে গেল।

ভোরের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেচে; যখন ঘর ছেড়ে বাইরে এলাম, উঠানের কচি ঘাস আর শাক-সব্জীগুলি আলো লেগে ঝল্‌মল্ করচে। চারিদিককার ঘরগুলি থেকে আরও কত লোক বেরিয়ে এল! কারও হাত বাঁধা, কারও হাত-পা ছুই-ই; কারও মাথা কামানো মুখে একগাল দাড়ি; কেউ এমন ভয়াবহভাবে আমাদের দিকে চাইচে যে তার দিকে আমাদের চাইবার উপায় নেই! হয়ত, মেরেই বসবে। আমাদের কারও হাতে কড়া নেই—দড়ি পর্য্যন্ত নেই দেখে এরা সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গেচে; আমরা যেন এখানে অনধিকার প্রবেশের অপরাধে অপরাধী। এদের দু' একজনকে চিনতাম, এখনও চিনি—এই সহরেরই তারা। তারা আমায় দেখে একটুখানি হাসল, আমিও অপ্রতিভ একটু হাসি দিয়েই দিলাম তার জবাব। জিজ্ঞাসা করতে পারতাম কেমন আছো? কিন্তু সে প্রশ্নটাই যেন এখানে অবান্তর। জিজ্ঞাসা করলে ওদের আঘাত দেওয়াই হ'বে শুধু।

একজন কিন্তু কাছে এসে চুপি চুপি জান্‌তে চাইল,—তোমরা বুঝি 'স্বদিশীর'?

হেসে বললাম, তাই বটে।

লোকটা একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললে, কতদিন হ'ল—?

ছ'মাস ক'রে প্রত্যেকের,—বললাম।

ছ'মাস দেখা-শুনো হ'বে তা' হ'লে! আমার এখনও এক বচ্ছর পাঁচ মাস ন' দিন বাকী।—যাই ভাই সরে, জেলারটা দেখে ফেললে, আজকের দিনটা হয়ত ভাতই জুটবে না।

চলে গেল। একেও চিনি, কিন্তু নামটা কিছুতেই মনে করতে পারচি না। হয়ত ওর সঙ্গেও স্কুলে পড়েছিলাম কোন কালে। মণ্টুর সঙ্গে পড়েচি।

ঘণ্টাখানেক পরে রামবাবু এসে বললেন, তুমি নাকি ওদিককার কয়েদীদের সঙ্গে কথা কয়েচ?

বললাম, কেন, তাতে দোষ কি?

রামবাবু বললেন, তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আসিনি আমি। ওটা নিয়ম নয়। বুঝতে পারলাম আমাদের নিয়ে রামবাবু একরাত্রির মধ্যেই বিব্রত হয়ে পড়েচেন। হয়ত ভাবচেন আমরা জেলের দাগী কয়েদীগুলিকে ক্ষেপিয়ে দেব,—কোন রাত্রে তারা হয়ত জেলের দ্বার ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়বে।

রামবাবুর কথার উত্তর দিতে পারতাম, কিন্তু হঠাৎ মনে হ'ল তাঁর দোষ কি? মণ্টুর বাবা ত তিনি ন'ন এখন, এখন উনি কারা-আইনের বন্দী,—কারাগারের সব চেয়ে নিরুপায় বন্দী সব চেয়ে দুঃখী বন্দী। চুপ করেই রইলাম।

কিন্তু তাঁর এই বাধা আমার মনকে আরও উগ্র করে তোলে। মনে মনে স্থির করলাম, সাধারণ কয়েদীগুলির সঙ্গে আলাপ আমাকে করতেই হ'বে।

দু'পহরে রামবাবু বাসায় গেলেন—জেলের কাছেই বাসা।

আরও দু'চারজনকে নিয়ে গেলাম সেই লোকটির কাছে যে সকালে যেচে আমার সঙ্গে কথা কয়েচে। বললাম, তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। কিন্তু তোমার নামটি ভাই কিছুতেই মনে করতে পারচি না।

হেসে ও বললে, না মনে থাকার মধ্যে আশ্চর্য্যের কি আছে! তুমি আর আমি আজ অনেক দূরে। যাক আমার নাম মধুসূদন।

হাঁ ঠিক, মধুসূদনই বটে। ক্লাসে ও খুব ভাল অঙ্ক করতে পারত, কতদিন ওর খাতা দেখে টুকে নিয়েচি। সে কথা ওরও নিশ্চয় মনে আছে।

বললাম, এখানে এলে কেন—?

মধু একটুখানি হাসল। বললে, কেনর কোন জবাব নেই, ও শুধু মনকে চোখ ঠারা। কোথা দিয়ে, কিসের জন্যে কি হয় আমরা তার কতটুকু জানি। জেলে বসে বসে আমি অনেক ভেবেচি, কিন্তু কোন প্রশ্নের পুরো জবাব পাইনি।

মধু যে এই সামান্য প্রশ্নে এতখানি উচ্ছাস প্রকাশ করবে তা' ভাবতে পারিনি। ভেবেছিলাম জেলখানার মত ওর মনটাও অন্ধকার হয়ে আছে। অপ্রতিভ হয়ে বললাম, তোমায় দুঃখ দেব বলে কিছু জিজ্ঞাসা করিনি মধু। কিছু মনে করো না।

মধু আবার একটু হেসে নিয়ে বললে, মন পদার্থ টিকে অত ঠুন্‌কো করে তুলতে পারলে এতদিন পাগল হয়ে যেতাম। কথা তা নয় কিন্তু আমি ভেবে দেখচি, পৃথিবীতে যত অপরাধ, যত পাপ প্রতিদিন ঘটচে—কেউ তা ইচ্ছে করে করচে না। কে যেন জোর করে, ঘাড় ধরে মানুষকে দিয়ে এই সব করিয়ে নিচ্চে। নইলে পৃথিবী এতদিনে বোদা হয়ে যেত, খবরের কাগজগুলোর বিক্রী যেত অর্দ্ধেক কমে।

মধুর কথা শুনে হাসবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ভয়ে যেন হাসি এল না। দু'জনে খানিক চুপ করে বসে থাকি,—দু'জনেই দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে আছি; কি বলব কিছুই ঠিক করতে পারচি না। ওদিকে কতকগুলি কয়েদী কাজ করচে—কাজের শব্দ আমাদের মনের নিস্তব্ধতাকে আঘাত করচে। বাইরে উদাস দু'পহর; মদের দোকানের সামনে পিকেটিং চলচে নিশ্চয়ই; মধুর সামনে বসে আছি: সামান্য কয়েদী মধু আর আমি মুক্তি-যুদ্ধের সৈনিক। মধুর সঙ্গে এককালে পড়তাম, তবু আজ তাকে বলবার মত কোন কথা খুঁজে পাই না,—কেন পাই না! দেশকে চাইচে এক করতে; কিন্তু মানুষ কেন মানুষের কাছ থেকে সরে যায়? তাদের এক করব কেমন করে?

মধুই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে। বলে, তোমার কাছে সব কথাই বলতে পারি বিশু—তোমার চোখে এখনও সেই ছেলেবেলার ছায়া! তোমাকে কাছে পেয়ে আমার মনেই হচ্চে না যে আমি বিয়ে করেচি, আমার তিনটি ছেলে-মেয়ে—তারা হয়ত আজ খেতে পাচ্চে না···

বচর চারেক দেশে ছিলাম না; মধুর বিয়ের কথাটুকুই জানতাম, তা'র পর—বললাম, কি করে তুমি এখানে এলে—?

মধু বললে, কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে চাকরী পেয়েছিলাম; মাঝে বড় মেয়েটার টাইফয়েড হ'ল—কিছু টাকা বের করে এনে খরচ করেছিলাম, হাতে পয়সা ছিল না একেবারে, তাই। কথাটা জানাজানি যখন হ'ল, তখনও সেটা পূরণ করবার মত কিছু সঞ্চয় করতে পারিনি। সোসাইটির কয়েকজনের একটু রাগ ছিল আমার ওপর; কাজেই মূল অপরাধের সঙ্গে আরও কয়েকটা যোগ হয়ে—

বুঝলাম, মেয়ের অসুখ সারিয়ে মধু জেল-ভোগ করতে এসেচে—পিতৃত্বের প্রায়শ্চিত্ত। মধুকে সান্ত্বনার একটা কথাও বলতে পারলাম না। এ'দেশে মধু আরও ঢের আছে—তারা বিয়ে ক'রে ষোল বচরে, পঁচিশ বচরে তিনটি ছেলে মেয়ের জন্মদাতা হয়, চল্লিশ বচরের মধ্যে উৎসাহের উৎসাহটি নিঃশেষ করে, গীতা খুলে বসে শান্তির সন্ধানে। ঋতু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আকাশের রং বদলায়, তারা সে খোঁজ রাখে না। রাশিয়ায় আর জারের স্বেচ্ছাচার চলচে না, ধর্ম্মের নামে বুজরুকী তুরস্কে বন্ধ হয়ে গেচে এ' কথা শুনলে তারা বিস্মিতের মত চেয়ে থাকে!

খানিক আগে মধুর জন্যে যে সহানুভূতি বোধ করছিলাম সেটা যেন হঠাৎ খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না। কেবলই মনে হচ্চে মধু চুরী করে জেলে এসেচে। বন্ধুদা'র একমাত্র গর্ব্ব তাকে চুরী করে জেলে আসতে হয় নি; বন্ধু-দা যদি শোনে যে আমার স্কুল-জীবনের বন্ধু মধু চুরীর অপরাধে আজ জেল ভোগ করচে, তা' হ'লে আমার সঙ্গে কথা বলতে ঘৃণা না হ'ক—সঙ্কোচ বোধ করবেই।

মধু জিজ্ঞাসা করলো, আর কথা কইতে ভাল লাগচে না, নয়? আমি জানি। সহানুভূতি দেখিয়ে লোকের কথা জানতে চাওয়া এক জিনিষ আর কথা জেনে সহানুভূতি দেখান একেবারে অন্য কিছু।

মধুকে কিছু বলতে পারছিলাম না; হঠাৎ পশ্চিম দিকের ঘর থেকে এক বুড়ো বেরিয়ে এসে বললো, বাবু আমার হাতটা দেখুন না।

কথাগুলি বললো সে হিন্দীভাষায় লোকটা হিন্দুস্থানীই বটে। বয়েস হয়েচে ঢের কিন্তু শরীর গড়ন এতটুকু আলগা হয় নি; ভুরুগুলি পর্য্যন্ত সাদা হয়ে গেচে—কাশফুলের মত। একটা চোখ কি করে বোধ হয় নষ্ট হ'য়ে গিছল উপস্থিত পাথর দিয়ে কাজ চালান হচ্চে। সে চোখটা সব সময়েই স্থির হয়ে আছে বলে সেটার দিকে চেয়ে থাকা চলে না, মনে হয় বুকের মধ্যে বিঁধে যাবে।

কোন উত্তর দেবার পূর্ব্বেই লোকটি বললো, বাবু, চুপ করে বসে দেখচ কি? বল না, আঁকা-বাঁকা এই লেখাগুলোয় কি বলচে? পৃথিবীর সঙ্গে মঙ্গল গ্রহের ঠোকাঠুকি কবে হ'বে বলতে পারো—?

বেশ ভেবে দেখলাম যে লোকটির কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে আমি পারি না। লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে বিশ্রী ভাবে হাসতে লাগল।···সত্যিই সেই হাসি বিশ্রী, ভারি বিশ্রী! ওর একটা চোখ আর অদ্ভুত হাসি দিয়ে ও যেন এই জেলখানাটাকে ঠাট্টা করচে।

খানিকটা বসে' বসে' গান গাইল গুণ্‌গুণ্ করে; কোমর থেকে একটি থলে বের করে' খানিকটা তামাক-পাতা চুণ দিয়ে রগ্‌ড়ে মুখে পুরে দিল; তাহার পর আমার মুখের দিকে চেয়ে বললো, বাবুজী দুনিয়া জীবন্‌কা স্বপ্না—

ও যে ঘরের থেকে বেরিয়ে এগেচে জেলের প্রহরীরা এতক্ষণ তা লক্ষ্য করেনি—দুপুরের নিস্তব্ধক্ষণটিতে তারা একটু ঝিমিয়ে নিচ্ছিল; জেলার বাবুও ত এতক্ষণ ঘুমুচ্চেন। কিন্তু একজনের হঠাৎ হুস হ'ল যে একজন কয়েদী ঘর থেকে বেরিয়ে আর সকলের সঙ্গে কথা কইচে, কথা কইবার কথা তার নয়; হাতে তার তালা-লাগানো কড়া পায়ে ভারি ভারি লোহার বেড়ী।

ছুটে এসে সে বললো, হিঁয়া ক্যা কর্‌তা, যাও ভিতর।

লোকটি অসহায় ভাবে আমাদের দিকে তাকায়, বিড়বিড় করে কি যে বললো তা সেই জানে, একটি চোখ ক্ষণকালের জন্য তীব্র হয়ে উঠ্‌ল—তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে গিয়ে ঢুক্‌লো নিজের ঘরে। প্রহরী ঘরের দ্বার বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল;—এই সুবিধেটুকুও সে বোধ হয় আর পাবে না।

লোকটা ঘরের মধ্যে কেবলি ঘুরে বেড়াচ্চে, বসে বসে দেখতে পাই। ওর গায়ের শক্তি আজ লোহার নিগড়ে বন্দী—হয়ত তাই আফশোষ করে।

মধুকে বললাম, কে ও—?

মধু বললে, খুনী; পাগলও বটে।

বিস্মিতের মত চাইলাম মধুর দিকে। বললাম, ডাকাত নাকি—?

মধু বললে, না, পাশের গাঁয়ের চালের কলে কাজ করত। ভারি ভাল লোক। তিনটি ছেলে, দুটি মেয়ে, ছেলের বৌ—এদের নিয়ে সুখে সংসার করছিল। ছেলে-গুলির ছাতি ছিল ওর চেয়েও চওড়া, শরীর ছিল লোহার মত কড়া। হঠাৎ তারা মারা গেল—এক সপ্তাহের মধ্যে, সবাই।

কিসে গেল—?

কলেরায়। ছেলেগুলি, ছেলেদের বৌ তিনটি—সবাই। এই ব্যাপারের দিন সাতেক আগে বড় ছেলের একটি মেয়ে হয়েছিল। কলেরা তাকে ছোঁয়নি। লোকটা খুন করেচে তাকেই, অর্থাৎ নাতনীকে।

মুখ দিয়ে হঠাৎ কথা বলতে পারলাম না, নিজের ছেলের মেয়ে—মাত্র সাতদিন আগে যার জন্ম, তাকে খুন! বিশ্বাস হয় না; যদি বিশ্বাস করি, তা' হ'লে সম্ভবের সঙ্গে অসম্ভবের তফাৎ রইল কতটুকু?

কিন্তু সবটা শুনে বিশ্বাস করতে হয়।

ছেলেগুলি মারা যাবার পর থেকেই বুড়োর চাল-চলনে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়; তারপর গেল তাদের বউগুলি। দিন তিনেক সে মা-বাপ হারা মেয়েটিকে নিয়ে ছিল, তারপর একদিন সকালে দেখা গেল, মেয়েটি মরে' পড়ে আছে; তার কচি গলায় মোটা মোটা আঙুলের দাগ। পুলিস এল, পাড়া-প্রতিবেশীরা এল। সবার সামনে দাঁড়িয়ে বুড়ো বললো, আমি খুন করেচি ওকে। কেন?

বুড়ো বললো, পরমেশ্বরের হুকুম। রাত্রে সে স্বপ্ন দেখে, ভগবান মূর্ত্তি ধরে এসে তাকে বলচেন, ওরি জন্যে তোর বংশে মড়ক; ও থাকতে তোর মঙ্গল নেই।

আর মধুর কাছে বসে থাক্‌তে ভাল লাগে না, উঠে আসি।

দুপুরে আলো এক সময় মুমূর্ষুর চোখের আলোর মত ম্লান হ'য়ে এল, আবার জেলখানাটার মধ্যে কাল সন্ধ্যার একটা ভয়াবহ ভাব। জেলারবাবু আসতেই দুপুরের খপরগুলি তাঁর কানে পৌছল। বুড়ো সেই আসামীর প্রতি তিনি বেত্রাঘাতের হুকুম দিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। রামবাবু বাড়ীতে বিড়িই খান।

আমাদের ঘরে বসেই শুনতে পাই, মার খেয়ে বুড়ো কয়েদীটা চীৎকার করচে! সে কি বিশ্রী আর ভয়াবহ! অন্ধকারও যেন জেলখানার মধ্যে আঁতকে উঠতে লাগল, যেন একটা ক্ষ্যাপা, হিংস্র জানোয়ার ক্ষুধাতুর হয়ে চীৎকার করচে!

বুড়োর শাস্তির ব্যবস্থা করে রামবাবু এলেন আমাদের ঘরে। আমার দিকে চেয়ে বললেন, তোমাদের আর বেশী দিন এখানে কষ্ট ভোগ করতে হবে না, শিগ্‌গীরই তোমাদের দমদমে ট্রান্সফারের ব্যবস্থা হ'চ্চে।

বন্ধুদা বললে, সেখানেও ত লোকের ভীড় বড় অল্প নয়।

রামবাবু বললেন, গভর্মেণ্ট তোমাদের জন্য সদাব্রত খুলে বসেন নি।

তাঁর চলে যাওয়ার পদশব্দ বাইরে মিলিয়ে যেতে আমরা প্রাণ খুলে হেসে নিলাম।

রামবাবু এবার বাসায় গিয়ে গোবর্দ্ধনদাকে নিয়ে পাশায় বসবেন; এখন থেকে কিছুক্ষণের জন্যে তিনি মন্টুর বাবা!

তিনদিন কেটে গেচে এবং এর মধ্যে এমন উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নি যা এখানে উল্লেখ করতে পারি। সেই বুড়ো আসামীটির এখনও বিচার হয় নি, তদন্ত চলচে। তাকে ঘর থেকে সূর্য্যের আলোয় আসতে দেওয়া হয় না; কুঠুরীর অপরিসর চৌকীখানায় বসে হয় সে দোঁহা আওড়ায় নয়ত যাকে ইচ্ছে গালাগালি দেয়। ওর সম্বন্ধে যে দণ্ডাদেশ হ'বে তার জন্যে ওর কোন রকম দুশ্চিন্তা আছে বলে মনে হয় না। সত্যিই, থাক্‌বার কোন কারণই বা কি—! পৃথিবীতে ওর প্রয়োজন ফুরিয়েচে।

সেদিন দুপুর বেলা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল; চট্ করে যাবার সাহস খুঁজে পেলাম না। কিন্তু না গিয়েও বিশ্রী। একটা অস্বস্তি ভোগ করিতে থাকি। শেষে পাহারার লোকটাকে কিছু বখ্‌শিসের লোভ দেখিয়ে গেলাম তার ঘরের সামনে। বুড়ো অল্পকাল আমার মুখের পানে চেয়ে থাকে; তারপর অত্যন্ত সন্তর্পণে একটুক্‌রো কাগজ আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, গাঁয়ে আমার কিছু টাকা আছে বাবু। একটি লোকের কাছে সেগুলি জমা আছে। এই কাগজটা দেখালেই পাবেন সেগুলো।

আশ্চর্য্য হয়ে বললাম, আর যদি জেলে না আসি, তা' হ'লে টাকাগুলো তোমায় দেব কি করে? বুড়ো বল্‌লে, টাকা আমার চাইনে। গাঁয়ে আমাদের বড় জলকষ্ট! টাকাগুলো দিয়ে একটি 'টিপ্‌-কল' করিয়ে দেবেন—আমার নাতনীর নামে। তার নাম ছিল, টুকুন্! বুড়োর চোখ দুটিতে মেঘ-মেদুরতা।

বললাম, তাকে ভালবাসতে—?

বুড়ো শুধু হাসলে। সেই তার জবাব, তার বড় জবাব আর নেই।

তবে তাকে খুন করলে কেন—?

পরমেশ্বরের হুকুম।'— বুড়ো বল্‌লো।

ওর রহস্যময় চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে থাকতে যেন ভয় হয়। নিঃশব্দেই ওর লোমশ, কঠিন হাতখানার উপর হাত রেখে অনুকম্পা জানাবার চেষ্টা করলাম।—এর চেয়ে বেশী কি বলতে পারতাম?

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই রামবাবুর সঙ্গে দেখা।

বললেন, কাল তুমি আবার বুড়ো কয়েদীটার সঙ্গে দেখা করেছিলে শুনলাম। ভারি অন্যায়। সে তোমার হাতে কি একটা কাগজ দিয়েচে, দেখতে চাই।

বুঝলাম যে সেপাইটার সততা আমি পয়সা দিয়ে কিনে নিতে চেয়েছিলাম, সেই তার 'নোকরীর' সম্মান রেখেচে বা রাখতে বাধ্য হয়েচে। হয় ত ভেবেচে, আমাদের মধ্যে কোন রকম ষড়যন্ত্র চলচে, কোন দিন আমরা বুঝি তাকে নিয়ে উধাও হ'ব।

কাগজটা কিন্তু রামবাবুকে দিতে চাই না।

রামবাবু বললেন, তোমায় স্নেহ করি বিশু, নইলে তোমার ব্যবহারের কড়া সাজা হয়। ছেলেমানুষি করো না, দেখি কাগজটা।

শেষ পর্য্যন্ত দিলাম সেটুকু তাঁরই হাতে। রামবাবুর পক্ষে রহস্য ভেদ করা সম্ভব ছিল না, সুতরাং সব কথা খুলে বল্‌লাম। রামবাবু আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন। আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, যাকে এত বেশী ভালবাসত, কেবল ঈশ্বরের হুকুম বলে তাকে খুন করলে!—ঈশ্বর কি মানুষকে দিয়ে সব কিছুই করাতে পারেন!

বললাম, সত্যিই তাই। জেলখানায় এসে পর্য্যন্ত এই কথাটাই আমি সব চেয়ে বেশী অনুভব করচি।

বোধ করি রামবাবুর মনে পড়চে একদিন তিনি বুড়োর ওপর বেত্রাঘাতের হুকুম দিয়েছিলেন না। যাবার সময় বললেন, I feel for him এর বেশী আর কিছু করতে পারি না!

একটু মোহ এসেছিল জেলখানাটার ওপর, কিন্তু এর নিষ্প্রাণ নিয়মানুবর্ত্তিতা, এর অসহ্য নিঃশব্দতায় ছ'দিন কাটতে না কাটতে পাগল হ'বার উপক্রম হ'ল। বন্ধুদা ত প্রত্যহ প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প করচে, আমরা ক'জন মিলে সামলে রেখেচি। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয় রোজ, কথা হয় ক্বচিৎ। বুড়ো কয়েদী তার রুদ্ধদ্বার ঘরের ভিতর থেকে চোখ দিয়ে আমার অনুসরণ করে। তার অনুরোধ আমাকে রাখতে হ'বে।

সাতদিনের দিন ঘুম থেকে উঠেই শুনি আমাদের ট্রান্সফার অর্ডার এসে গেচে। দমদমেই বটে, তবু রামবাবুকে ধন্যবাদ, সেখানে কথা বলবার আরও কতগুলি লোক মিলবে।

সন্ধ্যা সাতটার গাড়ীতে যাত্রা। পাঁচটার সময় থেকেই জেলের দ্বারে ছোটখাট একটি জনতা। ক'টি মেয়েও এসেচেন,—বন্ধুদার দিদি, অভয়ের পিসিমা, সুশান্তর মা···। মধু তার ঘর থেকে বাইরের দিকে চেয়ে দেখচে। হয় ত কোন পরিচিতকে খুঁজচে, দুটি দুর্ব্বল, কচি বাহুর স্বপ্ন দেখ্‌চে।

বুড়োকে দূর থেকে' রামরাম' জানাই।—রামবাবু কাছেই ছিলেন, কিন্তু বাধা দিলেন না।

দুল'ভ সামগ্রীর মত আমাদের অতি যত্নে গাড়ীর মধ্যে তুলে দেওয়া হয়। সহরের নর-নারী চললো পদব্রজে, শোভাযাত্রা করে। শাঁখের আওয়াজ উঠ্‌চে আর উঠ্‌চে মাতৃ-বন্দনা-ধ্বনি। সহরের অনতিসঙ্কীর্ণ পথের দুই প্রান্তের গাছগুলির মাথায় সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হ'য়ে আসচে। আমাদের গাড়ীর সামনে, পিছনে পুলিস। অভয়ের পিসিমা, বন্ধুদার দিদির মুখে আনন্দের আলো। গাড়ী থেকে তাঁরা অনেক দূর পিছিয়ে পড়েচেন, গাড়ীর অনেক দূর পর্য্যন্ত ধুলায় বিবর্ণ হয়ে গেচে, কিন্তু মুখে তাঁদের ক্লান্তির চিহ্ন খুঁজে পাই না! আমাদের ললাটে তাঁরা যেন ভারতের মুক্তি-প্রভাতের অস্ফুট আলোক-রেখা খুঁজে পেয়েচেন।

নর-নারীর কণ্ঠোচ্চারিত মাতৃবন্দনার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাড়ীর মধ্যে থেকে সবাই চিৎকার করচে। কিন্তু সন্ধ্যার অনতিগাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আমার কণ্ঠ হঠাৎ যেন সুর হারিয়ে ফেলেচে; পৃথিবীকে ভারি অসহায় বলে মনে হয়। নিজেকেও তাই।

মনে পড়চে মধুকে, সেই বুড়ো কয়েদীকে।—স্নেহ আর বিশ্বাসের কারাগারের বন্দী দুটি! দেশের মুক্তি হয় ত হ'বে কোন দিন,—কিন্তু সে মুক্তি মাটীর ভারতের; তার ধন-সম্পদের মুক্তি, বিদেশীর আধিপত্য থেকে সরকারী দপ্তর-খানাগুলির মুক্তি। কিন্তু সেই কি সব?

মধুকে কি করে মুক্তি দেব, কি করে বুড়োকে বুঝাব যে যার নামের দোহাই দিয়ে সে নিজের রক্তের শেষ চিহ্নটি পর্য্যন্ত নিঃশেষ করেচে, সে ভগবান নয়, তারই অন্ধকার মনের ভূত—!

রজনীগন্ধা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

রজনীগন্ধা রজনীগন্ধা সই
তোমার গন্ধে আকুল হইয়া রই,—
না জানি কখন ফুটিয়াছ বনে
অপরূপ রূপে দেখা দিলে মনে
গন্ধভিখারী চাহে না কিছুই
তব সুগন্ধ বই—
রজনীগন্ধা, রজনীগন্ধা সই !

রজনীগন্ধা রজনীগন্ধা বালা,
সন্ধ্যায় ধরি' দু'হাতে বরণডালা
নিখিল বিশ্বে করিছ আরতি
চিত্তঃ-আকাশে ওগো শাশ্বতি,
দেখি অবিরাম, নয়নাভিরাম
উৎসব-দীপ জ্বালা !
রজনীগন্ধা, রজনীগন্ধা বালা।

রজনীগন্ধা রজনীগন্ধা প্রিয়া
রজনীর প্রিয় বান্ধবী, দরদীয়া
বিরহ-মিলনে অন্তরপুর
উজলিছে তব বিভব মধুর
আপন লীলায় আপনি বিভোর
চিরপ্রেমাতুর হিয়া
রজনীগন্ধা, রজনীগন্ধা প্রিয়া !

——০——

নিরঞ্জন রায় আর উমা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

পূর্ব্বানুস্মৃতি

'পারি, নিরঞ্জন,' উমা ওর সরকারী গলায় বল্‌তে লাগ্‌লো, 'কিন্তু তা'র আগে আমার কয়েকটা কথা শুনে নাও। তোমার যা বল্‌বার, তা তুমি বলেছো; এইবার আমার কথা শোনো। তোমার বন্ধুরা আমার সম্বন্ধে কী মনে করেন, তা আমি জানি নে। সুকুমার সেন যদি তাঁদের প্রতিনিধি হন, তা হ'লে তাঁদের মতামতের প্রতি বিশেষ যে মূল্য আরোপ করি, তা-ও নয়। তাঁদের মতামত প্রার্থনা না করে' তুমি যদি আমার সাহায্য চাইতে, তা হ'লেই আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে দিতে পার্‌তাম। কারণ, নিরঞ্জন, তোমার মস্তিষ্ক খুব পরিষ্কার নয়। সেখানে ধারণার চাইতে কল্পনাই বেশি। আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতে-ভাব্‌তে —তোমার আশে-পাশে কী হচ্ছে না হচ্ছে, তা তুমি দেখ্‌তে শেখো নি। কোনো জিনিষই তোমার চোখে পড়ে না। ভারতবর্ষের মত প্রকাণ্ড একটা জিনিষও নয়। আমি— যা'র সঙ্গে তুমি দু' বছরের ওপর অন্তরঙ্গভাবে মিশ্‌ছো, সে-ও নয়। এখন প্রতিবাদ কোরো না; আর, পারো তো হাত দুটো অমন করে, মুচ্‌ড়িয়ো না। আমার সঙ্গে যে তোমার কোনো মিল নেই, এ-কথাটা এতদিনেও তুমি উপলব্ধি কর্‌তে পারলে না। তোমার জীবন কল্পনা নিয়ে, আমার কাজ নিয়ে। আমার লক্ষ্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা; তোমার, ব্যার্ণার্ড্‌ শ-র মত নাটক-লেখা। আমার মতে, তোমার কংগ্রেসে যোগদান করা উচিত; তোমার মতে আমার অভিনেত্রী হওয়া উচিত। দু'জনের বিশ্বাসই সমান দৃঢ়। তাই, মীমাংসা অসম্ভাব্য। আমি চরকা চালাই, বক্তৃতা দিই, পিকেটিং করি; আর তুমি বই পড়ো, প্রেম করো, বিলিতি সিগ্রেট্‌ খাও। বল্‌তে পারো, আমি আগে এ-রকম ছিলাম না; কিন্তু আমার প্রকৃতিতে আগাগোড়াই এ-সব জিনিষ ছিলো নিশ্চয়ই, নইলে একদিনে এমন প্রাবল্য নিয়ে তা ফুটে উঠ্‌তে পারে না। নিরঞ্জন, আমি তোমাকে পছন্দ করি, কিন্তু পছন্দ করা মানে আর কতটুকু! নিরঞ্জন, তুমি আমার কাছে প্রেম চাও, কিন্তু কী ক'রে আমি তোমাকে ভালোবাস্‌তে পারি?—'

'যেমন করে' একজন মেয়ে একজন পুরুষকে ভালোবাসে। তুমি মেয়ে, আমি পুরুষ, পরস্পরের ওপর এই আমাদের সব চেয়ে বড় দাবী। দু'জনের যৌবন আমাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় মিল।'—নিরঞ্জনের মুখ থেকে তীব্রবেগে কথাগুলো বেরুতে লাগ্‌লো—'কী আসে যায়, তুমি যদি খদ্দর পরো, আর আমি বিলিতি সিগ্রেট্‌ খাই? কী আসে যায়, তোমার যদি বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা থাকে, আর আমার লেখ্‌বার? প্রেম এত ছোট জিনিষ নয়, উমা, যে এই-সব ছোটখাটো বৈষম্যও তা'তে সইবে না। আমাদের মধ্যে কোনো মিল যদি না-ই থাক্‌বে, তা হ'লে কেন আমি তোমাকে ভালোবাসি? আমি যে তোমাকে ভালোবাস্‌তে পার্‌ছি, তোমার প্রতি মুহূর্ত্তের প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও প্রতি মুহূর্ত্তে ভালোবাস্‌তে পার্‌ছি, তা'তেই কি প্রমাণ হয় না যে কোনো-খানে, appearances ছাড়িয়ে অনেক নীচে, কোনো-এক অন্ধকার গভীরতায় আমাদের দু'জনার পরিপূর্ণ ঐক্য আছে? এবং সেই ঐক্য হচ্ছে আমাদের এই মধুর ও প্রধান বৈষম্য; তুমি মেয়ে, আর আমি পুরুষ। তুমি আমাকে আকর্ষণ করো, এবং আমি তোমাকে আকর্ষণ করি; না করে'ই পারি নে। তুমি শপথ করে' বল্‌লেও আমি বিশ্বেস করবো না যে মনে-মনে আমার প্রতি তোমার প্রবল আকর্ষণ নেই। কিন্তু গান্ধীর শিষ্য হ'য়ে তুমি যে শুধু স্বদেশী হয়েছো তা নয়; সন্ন্যাসী হয়েছো—মানে, ভণ্ড হয়েছো। এবং সেখানেই আমার আপত্তি। তোমার ধারণা হয়েছে যে প্রেম—যা মানুষের সব চেয়ে স্বাভাবিক বৃত্তি—প্রেম পাপ। উপভোগ অন্যায়।

তাই তুমি নিজকে কষ্ট দিচ্ছো ; নিজের, এবং সকলের সঙ্গে ভণ্ডামি কর্‌ছো ; নিজকে বিশ্বাস করাবার চেষ্টা কর্‌ছো যে প্রেম না হ'লেও তোমার চলে, প্রেম তুমি চাও না ; এবং আমাকে বিশ্বাস করাবার চেষ্টা কর্‌ছো যে আমাকে তুমি ভালোবাসো না। কা'কে বাসো, শুনি ? কাউকেই নয়; কেননা, ভালোবাস্‌তে তুমি ভয় পাও, তোমার মনে বিকৃতি ঘটেছে। যদি সত্যি-সত্যি মনের কথা বল্‌বার মত সাহস তোমার থাক্‌তো, তা হ'লে তুমি অসঙ্কোচ গৌরবে স্বীকার কর্‌তে যে তুমি আমাকেই ভালোবাসো, ভালোবাসো নিশ্চয়ই ভালোবাসো···'বল্‌তে-বল্‌তে নিরঞ্জন একটা চেয়ারের ওপর কোল্যাপ্‌স্ কর্‌লো !

'প্রতিবাদ করে' যখন কোনো লাভ নেই,' উমা আরম্ভ কর্‌লো ; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে বেলা এসে ঢুক্‌লো। নিরঞ্জন চট্‌পট্ চুলগুলোর ওপর একবার হাত বুলিয়ে, পাঞ্জাবিটা একটু টান্ করে', মুখ-চোখের চেহারা ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের বেগ যথাসাধ্য স্বাভাবিক করে' ভদ্রলোক সাজ্‌লো। ওর চেষ্টায় যে কোনো ফল হ'তেই হ'বে, তা নয় ; তবু চেষ্টা কর্‌তে দোষ নেই।

বেলা জিজ্ঞেস্ কর্‌লো, 'আপনার চা এ-ঘরেই আন্‌বো, না পাশের ঘরে যাবেন ?'

উমা ওর রিস্ট-ওয়াচ-এর দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, 'আর সাত মিনিটের মধ্যে আমার কাছে যুগ-বাণী প্রকাশালয় থেকে এক ভদ্রলোক আসবেন। বেলা, জবাহরলালের সেই জীবনীর পাণ্ডুলিপিটা সংশোধন করে' রেখেছো ? বেশ। আমি নিজেও একবার দেখে দিচ্ছি।' উমা ইজি-চেয়ার ছেড়ে উঠ্‌লো।—'নিরঞ্জন, তুমি পাশের ঘরে গিয়েই চা খাও।'

• • • •

'একখানা কচুরি খেয়ে দেখ্‌বেন না ?' বেলা বল্‌লো, 'ভেতরে মাংস আছে।'

নিরঞ্জন ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বল্‌লো, 'খাচ্ছি, খাচ্ছি।' বলে' এক টুক্‌রো কচুরি ভেঙে মুখে দিলো। যদিও তা'র একটুকো খেতে ইচ্ছে কর্‌ছিলো না। কিন্তু না খেলে বেলা হয়-তো offence নেবে। কিসে এবং কখন যে লোকে offence নেয়, নিরঞ্জনের সে-বিষয়ে খুব অস্পষ্ট ধারণা, কিন্তু এটুকু সে বোঝে যে সংসারে—ভদ্রলোক এবং মহিলাদের মধ্যে কথায় কথায় offence নেবার রীতি আছে। নিরঞ্জন কোনোকালেও পুরো-দস্তুর ভদ্রলোক হ'য়ে উঠ্‌তে পারে নি, বহু চেষ্টা করে'ও নয়। তা'র ম্যানার্স নাকি deplorable—সবাই তা-ই বলে। কখন্ এবং কোথায় কী কর্‌তে এবং বল্‌তে হয়, এবং—যা জানা বেশি দরকারী—কী না-কর্‌তে এবং না-বল্‌তে হয়, নিরঞ্জন তা কিছুতেই মনে রাখতে পারে না। শর্ব্বরীর সব উপদেশ মাঠে মারা যায়। নিরঞ্জনের, তাই, নিজের জন্য ভয়ের সীমা নেই ; কোনো পার্টিতে গেলে ভয়ে-ভয়ে ও চুপ করে'ই থাকে। ভাগ্যিস্ থাকে। নিরঞ্জন রায়ের একবার মুখ ছুট্‌লে আর কা'র সাধ্যি কথা বলে—? হোক্ সে সুকুমার সেন, যে রসিকতা ফিরি করে' বেড়ায় ; হোক্ সে অমিতা চন্দ—pretty and witty অমিতা চন্দ, ফুর্‌ফুরে মেয়ে, ঝক্‌ঝকে মেয়ে অমিতা চন্দ—যে-মেয়ের মত আমাদের মধ্যে আর কেউ নয়, কেউ নয় ; হোক্ সে অতন্ মিত্র, অ্যাপোলোর মত যা'র চেহারা, যা'র কালো চোখ আলস্যে আর বাসনায় মদির, যা'কে দেখে মাথা ঠিক রাখ্‌তে পারে, এমন মেয়ে বাঙ্‌লা দেশে কেউ নেই—অবিশ্যি অমিতা চন্দ ছাড়া ; হোক্ সে সাবিত্রী বোস্, সোনার ঘণ্টার মত যা'র চুল মাথার দু'দিক দিয়ে নেবে এসেছে, রূপোর ঘণ্টার মত বেজে ওঠে যা'র গলার স্বর। নিরঞ্জন যখন কথা বল্‌তে থাকে, সবাই হতভম্ব হ'য়ে তাকিয়ে থাকে ওর মুখের, দিকে যতক্ষণ চীৎকার কর্‌তে গিয়ে ওর গলা ভেঙে না যায়, একটা সোফার উপর স্তূপ হ'য়ে ভেঙে পড়ে' ও হাঁপাতে না থাকে।

কিন্তু এ-রকম ঘটনা সচরাচর নয় ; নিরঞ্জন সাবধান থাকে। কিন্তু যখন হয়, পরে ওর অনুতাপের সীমা থাকে না ; পরে ওর বিনয়ের আতিশয্যে সবাই অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ে। ও কেলেঙ্কারি করেছে ; এ-অপরাধ ওর ক্ষমা করা হোক্ ; বাকি জন্মের মত ও একেবারে লক্ষ্মী ছেলে হ'য়ে থাক্‌বে। এবং, সেই ক্ষমা অর্জ্জন কর্‌বার জন্যে নিজকে ও এত মৃদু, এত ছোট করে' ফেলে যে তখন ওকে দিয়ে আপনি যা খুসি তা-ই করিয়ে নিতে পারেন। এখন, যেমন, বেলা ওকে কচুরি খাওয়াচ্ছে। উমার সঙ্গে এইমাত্র ওর যে-বাচনিক ডুয়েল্ হ'য়ে গেলো, তা'র ফলে নিজকে নিয়ে

ও এখন বেজায় সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়েছে ; কখন্ কী অভদ্রতা করে' ফেলে, সে-ভয়ে ওর চেয়ারটায় আরাম করে' বস্‌তেও পার্‌ছে না ; চামচে দিয়ে চা-টা নাড়্‌বার আগে দু'মিনিট ভাব্‌ছে—এটা ওর উচিত হ'চ্ছে কিনা। সেই ভয়েই ও কচুরি খাচ্ছে—যদিও খাবার ইচ্ছে ওর এক বিন্দুও নেই।

কিন্তু কেন ও নিজকে একেবারেই সাম্‌লাতে পারে না ? কখনো, কোথাও নয় ? সামান্য ব্যাপারেই কেন জ্বলে' ওঠে, একটুতেই ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে ? লোকের উপহাস—এবং যা আরো খারাপ—করুণা সহ্য করে ? অন্য লোকের কাছে যেমন-তেমন, কিন্তু উমার কাছে এসে এই রকম 'কাণ্ড-কারখানা' অমার্জ্জনীয়, অমার্জ্জনীয়। এই সব সময়ে উমার চোখে ওকে কেমন দেখায়, নিরঞ্জন তা কল্পনা কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লো।···না, উমা ওকে সঙ্ সাজায় নি ; নিরঞ্জন নিজেই ওর সে পরিশ্রম বাঁচিয়েছে। ভুল, ভুল ; নিরঞ্জনের সব কথা ভুল। উমা কোনোকালেও ওকে ভালোবাস্‌বে না। উমাই ঠিক বলেছে ; কী করে' উমা ওকে ভালোবাস্‌তে পারে ? ও দুর্ব্বল, দুর্ব্বল। ও হীন, তুচ্ছ, অবিবেচ্য। ওকে চোখেই পড়ে না। ওকে চেষ্টা কর্‌লেও আমলে আনা যায় না। নিরঞ্জন, তুমি আর বাইরে মুখ দেখিয়ো না ; নিজের ঘরে বন্ধ হ'য়ে পড়ে' থাকো, বাকি জন্মের মত 'Shame shall be thy lot'।

'আপনার চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে না তো ?'

'ঠাণ্ডা ? না, না, মোটেও তো নয়।' নিরঞ্জন হঠাৎ অথই জলে পড়ে' হাবুডুবু খেতে লাগ্‌লো। এক চুমুকে পেয়ালার বাকি চা-টা শেষ করে' আবার বল্‌লো, 'মোটেও তো ঠাণ্ডা হয় নি, মোটেও নয়।'

'চা-টা খাবার মত হয়েছে তো ?'

চমৎকার হয়েছে, চমৎকার। এত ভালো চা আমি বেশি খাই নি। আপনাকে অনেক আগেই বোধ হয় বলা উচিত ছিলো, কিন্তু কখন্ কী বল্‌তে হয়, আমি কিছুতেই তা মনে কর্‌তে পারি নে। Deplorable manners আমার। ক্ষমা কর্‌বেন।'

নিরঞ্জন বেলার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখ্‌লো, তা'র মুখ অন্য দিকে ফেরানো। নিরঞ্জন উস্‌খুস্ কর্‌তে লাগ্‌লো। ওর কথাগুলো কি তা হ'লে বেলা শোনে নি ? কিন্তু শুনেছে নিশ্চয়ই, নইলে একটু পরে নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস্ কর্‌বে কেন ?—'আর-এক পেয়ালা খাবেন ?'

'নিশ্চয়ই—মানে, if you please ; if it doesn't mean a frightful lot of trouble to you।' হঠাৎ শারীরিক যন্ত্রণার মত একটা কথা তা'র মনে ফিরে' এলো। রুদ্ধশ্বাসে সে বল্‌তে লাগ্‌লো, 'আমার ইংরিজি ভদ্রতার বুক্‌নিগুলো ক্ষমা কর্‌বেন ; বাঙলায় ও-সব বলা যায় না বলেই—। কিন্তু বিশ্বেস করুন্—they are sincere, I really mean them -ঐ যাঃ, আবার ইংরিজি হ'য়ে গেলো।' নিরঞ্জন হতাশভাবে চেয়ারে হেলান্ দিলে।

বেলা নীরবে নিরঞ্জনের খালি পেয়ালা ভর্ত্তি করে' দিলো।

হঠাৎ নিরঞ্জন বল্‌লো, 'আপনি চা খাচ্ছেন না যে ?—এটাও আমার অনেক আগে জিজ্ঞেস্ করা উচিত ছিলো—তা-ই নয় ? না জানি আপনি আমাকে কী ভাবছেন।'

বেলা চায়ে দুধ আর চিনি মিশিয়ে বল্‌লো, 'আমি আগেই খেয়েছি। চা-টা খুব বেশি কড়া হ'য়ে গেছে কি ? আর দুধ দরকার হ'বে ? বা, চিনি ?'

নিরঞ্জন চায়ে চুমুক দিয়েই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে পড়্‌লো ; 'ঠিকই হয়েছে। চা আমি কড়া করেই খাই—খুব কড়া। ঠিকই হয়েছে ; দুধ-চিনি কিচ্ছু দরকার নেই। Excellent tea মানে, চমৎকার চা। ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আমার প্রতি আপনার এত দয়া !'

বলে' নিরঞ্জন বেলার দিকে তাকালো ; কিন্তু বেলার মুখ তখন অন্য দিকে ফেরানো। নিছক ভদ্রতা ;—নিরঞ্জন ভাব্‌তে লাগ্‌লো—কিন্তু ভদ্রতাও কত সুন্দর হয়, কত মধুর। হ্যাঁ, মধুর—এমন কি, touching। শুধু মুখের কথাই তো খরচ হয়, মিষ্টি করে' বলা একটু কথা—তবু, মন তা'তে খুসি হয়, হৃদয়কে তা স্পর্শ করে। নিরঞ্জন এম্‌নিই অপদার্থ যে এই ভদ্রতা কর্‌তেও সে শেখে নি। বেলা যদি কখনো ওর বাড়ি যায়, তা হ'লে ও কখনোই তা'কে এই রকম আপ্যায়ন করতে পারবে না ; হয়-তো চা খাওয়াতেই ভুলে' যা'বে ; হয়-তো নিজেই সারাক্ষণ কথা বল্‌তে থাক্‌বে। চেয়ারের হাতলে অঙ্গুল দিয়ে টোকা দিতে-দিতে সে বার-বার মাথা নাড়্‌লো। না, তা'কে দিয়ে কিচ্ছু হ'বে না। কিছু

হবে না। এক যদি নাটক লেখা হয়। নাটক ও লিখবেই, এমনি একটা প্রতিজ্ঞা না ওর মনে ছিলো? আজ সকালেই না ও মনে-মনে ভাব ছিলো—চুলোয় যাক্ উমা, বার্ণার্ড শ-র মত ও লিখ্‌বেই, সাহিত্য নিয়েই ওর জীবন? বাজে, বাজে, বাজে কথা। নিরঞ্জন রায় আবার লিখবে! একটা মেয়েকে ছিনিয়ে নেবার ক্ষমতা যার নেই, একটা মেয়ের ভালোবাসা পাবার যোগ্যতা যা'র নেই, সে আর লিখ্‌বে! এমন অসম্ভব স্পর্দ্ধা কী করে' তা'র হ'তে পেরেছিলো? নিরঞ্জনের চোখের সাম্‌নে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড মিলিয়ে যেতে-যেতে একটি-মাত্র সত্যে এসে ঠেক্‌লো: প্রেম। প্রেম; প্রেম ছাড়া জীবন বৃথা। কেন মানুষ টাকা রোজগার করে, বই লেখে, কলকজা বানায়, ছুটোছুটি, কথা-কাটাকাটি করে—আসলে, যখন, মানুষকে যা বাঁচিয়ে রাখে, তা প্রেম, প্রেম ছাড়া আর কিছুই নয়? কেন এত সভা-সমিতি, কেন এরোপ্লেন্ আর ভ্যাল্‌কে'স্ পুনোপুনি আর দাঙ্গা হাঙ্গামা, বার্ণার্ড শ আর জি, কে, চেস্‌টার্‌টন্, যখন, এক প্রেম ছাড়া কিছুতেই কিছু আসে যায় না? ভালোবাস্‌বে—এবং ভালোবাসা পাবে, এ-ই কেন মানুষের জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য নয়? কারণ, তা হ'লেই সব জিনিষেরই মানে হয়; আর, তা না হ'লে কিছুরি কোনো মানে হয় না। কেন মানুষ অন্য সব কাজ, অন্য সব চিন্তার আগে, সবার আগে এরি চেষ্টা করে না—ভালো-বাস্‌তে এবং ভালোবাসা পেতে!' কেন অনর্থক এই হৈ-চৈ, এই ভিড়-ঠেলে-চলা, মাথায়-মাথায় ঠোকাঠুকি, পয়সার জন্যে, যশের জন্যে কাড়াকাড়ি, ইংরেজদের সঙ্গে শত্রুতা করে' দেশের লোকের হাতে মার খাওয়া।.....

হঠাৎ নিরঞ্জন বেলাকে জিজ্ঞেস্ কর্‌লো, 'আপনি কা'কে ভালোবাসেন?' সঙ্গে-সঙ্গে কপাল থেকে গলা পর্য্যন্ত লাল হ'য়ে উঠে' বেলা চেয়ার ছেড়ে উঠে' দাঁড়ালো। 'Shy! Shy! Shy!'—ইউজিন্ মার্জ্জ্যাক্‌স্-এর সেই গভীর নৈরাশ্য আবার নিরঞ্জনের মনে কথা কয়ে' উঠ্‌লো: All the love in the world is longing to speak; only it dare not, because it is shy! shy! shy!' লজ্জা, নিদারুণ, নিষ্ঠুর লজ্জা; মরে' গেলেও কেউ স্বীকার করবে না—পারতপক্ষে, নিজের কাছেও নয়। কোনো জিনিষই নিরঞ্জনের চোখে পড়ে না—উমা ঠিকই বলেছে; কিন্তু ওর instinctগুলোর অসাধারণ প্রখরতা ও নিজেই অনুভব করে (আর, সেই জন্যেই তো ওর বিশ্বাস করবার সাহস হয়েছিলো যে নাটক-লেখা ওর হ'বে); এবং instinct-এর কখনো ভুল হয় না; তাই, বেলার লজ্জায় লাল মুখের দিকে একবার তাকিয়েই ও বুঝতে পেরেছে—জান্‌তে পেয়েছে যে বেলা ভালোবাসে। বেলাও ওর মত একজন; তাই বেলা ওকে বুঝতে পারে, তাই ওর প্রতি বেলার অত দয়া; বেলার ভদ্রতা নিছক ভদ্রতা নয়, তা'র আড়ালে সহানুভূতি আছে। নিরঞ্জনের পক্ষে এটা একটা প্রকাণ্ড আবিষ্কার; নিরঞ্জন আনন্দে হেসে উঠ্‌লো। সেই হাসির শব্দ বেলার অতি-দীর্ঘ কুমারী-জীবনের সহস্র নিরম-কানুনের শক্ত বাঁধাবাঁধিকে মুহূর্ত্তের জন্য ঢিলে করে' দিয়ে গেলো। মুহূর্ত্তের জন্য ও জলে' উঠ্‌লো; 'হাস্‌ছেন?'

নিরঞ্জনের প্রথম instinct ওকে আবার সাহায্য করলো। 'হাস্‌ছি; কিন্তু আপনাকে ঠাট্টা করে' নয়; অভিনন্দন করে'। আপনি তো জানেন না যে আমাকেই পৃথিবীর সব লোক ঠাট্টা করে, কাউকে ঠাট্টা করবার ক্ষমতা আমার নেই।'

মুহূর্ত্তের জন্য বেলা জলে' উঠেছিলো; সে মুহূর্ত্ত ফুরিয়েছে; এখন সে পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু ওকে দরজার দিকে এগোতে দেখেই নিরঞ্জন এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে' ছুটে' গিয়ে ওর পথ আগ্‌লে দাঁড়ালো। পাঞ্জাবির পকেটসুদ্ধ হাত দুটো পেছনে টেনে নিয়ে একরা করে' বেলার মুখের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে' ও অন্যরকমভাবে বল্‌তে লাগ্‌লো, 'আমার কাছে লজ্জা করবেন না, আমিও আপনার মতই একজন। সেই জন্যই তো আমার কাছ থেকে আপনি লুকিয়ে থাক্‌তে পারলেন না। কী করে'ই বা পারবেন?—আমি একেবারে হো-ও লেস্, কিন্তু কতগুলো জিনিষ আমি ঠিক বুঝি। জানেন না, এই মুহূর্ত্তে আপনাকে পেয়ে আমার কত ভালো লাগ্‌ছে। এতক্ষণ আমার জীবণ মন-খারাপ ছিলো—কেন, তা তো আপনি জানেনই। উমা আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে,—ফিরিয়ে অবিশ্যি বহুদিন ধরেই দিচ্ছে, কিন্তু আজ প্রথম ওর মুখ থেকে স্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যান শুন্‌লাম। ওর কাছ থেকে তাড়া খেয়ে আমি

ছিট্‌কে পড়্‌ছিলাম, আপনি দিলেন আশ্রয়। উমা কাজের লোক, আমার কথা শোনবার সময় ওর নেই, ভালোবেসে ও সময়ের আর উৎসাহের বাজে খরচ করতে চায় না। আমি ওর উপহাসের পাত্র, শুধু ওর নয়—সমস্ত পৃথিবীর; কারণ, পৃথিবীর সব লোক উমার মত ব্যস্ত, উমার মত হিসাব্‌ফ্রিট্। আমার প্রচুর অবসর নিয়ে আমি একা-একা ঘুরে' বেড়াই, কেই আমাকে আমল দেয় না। এক-এক সময় ওদের তুলনায় নিজকে এত ছোট, এত নগণ্য মনে হয় যে মরে' যেতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, এই পৃথিবীতে আমার না জন্মালেই ভালো ছিলো।...এম্‌নি মন নিয়ে আমি বসে' ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ এক শুভ মুহূর্ত্তে আপনি আমার কাছে নিজকে উদ্ঘাটিত করলেন, আপনার মধ্যে আমি নিজকে দেখ্‌লাম, দেখ্‌লাম, পৃথিবীতে আমি একেবারে একা নই। আমি একা নই; এই আনন্দেই তো তখন আমি হেসে উঠেছিলাম।...আপনাকে'—নিরঞ্জনের মুখে বিস্ময়ের গর্ব্বিত হাসি ফুটে উঠ্‌লো, প্রবলতরো ভাবে সে বলে' যেতে লাগ্‌লো 'আপনাকে আমি ধরে' ফেলেছি, এখন আর আমার কাছ থেকে আপনি কিছুই গোপন করতে পারছেন না। বরং বলুন্—সব বলুন, তা'তে আপনারো ভালো হবে। কে সে? কেমন দেখ্‌তে? কেমন তার কথা? কবে তা'কে প্রথম দেখেছিলেন? সব বলুন, আমার মত ভালো শ্রোতা আর পাবেন না।' নিরঞ্জন চুপ করতে যাচ্ছিলো, কিন্তু হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় সে অত্যন্ত মৃদুস্বরে, প্রায় কাণে-কাণে বলার মত করে' বল্‌লে, 'আপনার অদৃষ্ট হয়তো আমার চাইতে ভালো; আপনি হয়তো তা'র ভালোবাসা ফিরিয়ে পেয়েছেন? কিম্বা হয়তো সে আপনার দিকে ফিরেও তাকায় না, আপনার দুর্ভাগ্য হয়তো আমার চেয়েও বড়? কিন্তু যা-ই হোক্ না কেন—'

বেলার মুখের ওপর চোখ পড়্‌তেই নিরঞ্জন বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। বেলার মুখ কাগজের মত শাদা, তা'র চোখ বোজা, তার নীচের ঠোঁট থর থর করে' কাঁপ্‌ছে। কী হ'ল এর মধ্যে?...হঠাৎ নিরঞ্জন যেন চাবুকের বাড়ি খেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠ্‌লো, চাঁহাত মোচ্‌ড়াতে-মোচ্‌ড়াতে আর্ত্তস্বরে সে বল্‌তে লাগ্‌লো, 'ক্ষমা করবেন, ক্ষমা করবেন আমি একেবারে ভুলে' গিয়েছিলাম,—হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে সে আঙুলের গাঁটগুলো মাথার দু'পাশে ঠুক্‌তে লাগলো—'আমি ভুলে' গিয়েছিলাম যে ভদ্র-সমাজে কেউ কাউকে এ-সব কথা জিজ্ঞেস করে না—মানে, ততখানি আলাপ আপনার সঙ্গে আমার নেই। I've been awfully imperti nent—তা-ই নয়? কিন্তু বিশ্বেস করুন, এটা আমি ইচ্ছে করে' করি নি; আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম—সব কথাই আমি ভুলে যাই। কেন আপনি আমাকে আগেই থামিয়ে দিলেন না? কেন মনে করিয়ে দিলেন না আমাকে? ছি-ছি—I've behaved like a fool—a fool and a cad। বলুন, আপনি কি কখনো আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন?' নিরঞ্জন মাথার চুলগুলো ধরে' পাগলের মত টান্‌তে লাগ্‌লো।

হাজার হ'লেও, বেলার রক্তমাংসেরই তো শরীর, এবং রক্তমাংসের সহ্য করতে পারার একটা সীমা আছে। নিরঞ্জনকে বিমূঢ় করে' দিয়ে বেলা ছুটে' ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু দরজার কাছে বাধা পেলো উমাকে। নিমেষে বেলার সমস্ত রক্তমাংস পাথর হ'য়ে গেলো।

'কী হয়েছে, বেলা?' উমা একবার বেলার, একবার নিরঞ্জনের মুখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস্ কর্‌লো, 'তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?'

নিরঞ্জন নতমুখে অপরাধ স্বীকার কর্‌লো, 'আমি ওঁকে অপমান করেছি।'

'অপমান করেছো?'—উমার মুখে কৌতুকের হাসি ফুটে উঠ্‌লো—'কী রকম?'

নিরঞ্জন অসঙ্কোচে বল্‌লে, 'আমি ওঁকে এমন সব কথা বলেছি, যা কোনো ভদ্রলোকের কোনো মহিলাকে বল্‌বার রীতি নেই। সেই জন্য উনি offence নিয়েছেন। অবিশ্যি, ক্ষমা আমি চেয়েছি। তবে, উনি তা গ্রহণ করেছেন কিনা সন্দেহ।

উমা, তুমি যদি আমার হ'য়ে ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলো—'

'তা-ই নাকি?' উমার তীক্ষ্ণদৃষ্টি বেলার সমস্ত মুখ তন্নতন্ন করে' খুঁজে দেখ্‌লো, 'তা-ই নাকি, বেলা?...হ'বেও বা; নিরঞ্জনের তো আবার কাণ্ডজ্ঞান নেই। কিন্তু, আশা করি, বেলা, তুমি ওকে বেশ যত্ন করে'ই চা খাইয়েছো। আশা করি, বেলা, ওর এ-সামান্য ত্রুটি তুমি গায়ে মাখো নি। ওর প্রতি যে অসীম দয়া তোমার।'

নিরঞ্জন গাঢ়স্বরে বল্‌তে লাগ্‌লো, 'সত্যি অসীম দয়া। উমা, আমি যখন—'

উমা ওর কথা কেটে দিয়ে বল্‌লো (হঠাৎ ওর গলার আওয়াজ সজীব, উচ্ছল্‌—এমন কি, লঘু হ'য়ে উঠ্‌লো; নিরঞ্জন তা'র মধ্যে সেই পুরাণো 'subtle cadence' গুলো শুন্‌তে পেলো)—উমা বল্‌লো, 'চলো নিরঞ্জন, একটা ট্যাক্সি নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি; চলো।'—উমা নিরঞ্জনের হাতের ওপর হাত রাখলে—'আর, ছাখো বেলা', উমা ওর শুষ্ক সরকারী ভাষায় বল্‌লো, 'গেলো মাসের আয়-ব্যয়ের হিসেবটা কাল্‌কে সমিতিতে রাখিল করতে হ'বে। একটা খস্‌ড়া করে' রেখো—আমি ফিরে এসে দেখ্‌বো।'

বেলা মিলিয়ে গেলো। নিরঞ্জনের হাত ধরে' উমা দরজার দিকে এগোচ্ছে। উমা ঠোঁটের এক কোণে হাস্‌ছে, প্রায়ই ও যেমন করে' হাসে—তবু এখনকার হাসি যেন একটু আলাদা। আর নিরঞ্জন—নিরঞ্জনের বুকের মধ্যে তোলপাড় চল্‌ছে; সেখানে প্রত্যেক হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে একটি গান বেজে উঠ্‌ছে: 'আমি সুখী; আমার মত সুখী পৃথিবীতে আর কেউ নয়।'

দৃশ্যটি সুন্দর; সুতরাং এখানেই যবনিকা টানা যাক্।

(৪)

দৃশ্য-পরিবর্ত্তনে যেটুকু দেরী হ'ল, তা'তে ওদের ট্যাক্সি অনেকদূর এগিয়ে গেছে। হ্যারিসন্ রোড-এর ক্রসিং-এ ওদেরকে ধরা গেলো। কেননা ওদের ট্যাক্সি সেখানে এসে থাম্‌তে বাধ্য হয়েছে—নইলে শেয়ালদা থেকে হাওড়ার দিকে আর হাওড়া থেকে শিয়ালদার দিকে বিপুল ট্রাফিকের স্রোত অনায়াসে চলাফেরা করবে কী করে'? কিন্তু পার্ক সার্কাসের একখানা বাস্ (ড্রাইভার অনেক দূর থেকে সুবিধে দেখ্‌তে পেয়ে accelerator চেপে দিয়েছিলো) হাঁপাতে-হাঁপাতে চলে' গেলো, পুলিশের সর্ব্বশক্তিমান বাহু আনত হ'ল; হ্যারিসন্ রোড-এর দু'দিকে স্বীকৃত ট্রাফিক্ একসঙ্গে চলে' উঠ্‌লো; ওদের ট্যাক্সি কলেজ ষ্ট্রীট দিয়ে হু-হু করে' ছুটতে লাগ্‌লো। নিরঞ্জন তখন কবিতা আবৃত্তি করছে।

যখনি ওর মন খুব ভালো লাগে, তখনি নিরঞ্জন কবিতা আবৃত্তি করে। অবিশ্রি ওর আবৃত্তি শুনে' কেউ বুঝ্‌তে পারে না; ওর মুখ থেকে শুন্‌লে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতাও আপনার কাছে অর্থহীন কিচিরমিচির মনে হ'বে। তা হোক্—ও তো আর লোককে শোনাবার জন্যে কবিতা আওড়ায় না, লোকে না বুঝ্‌লে ওর ভারি তো বয়ে' গেলো! লোককে শোনাতে ও চায়ও না—তাই এত মৃদুস্বরে কথাগুলো উচ্চারণ করে যে—এখনকার কথাই ধরুন—ওর আধ হাত দূরে বসে'ও উমা শুধু একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন শুন্‌তে পাচ্ছে। উমা অবিশ্রি জানে, কী ব্যাপার। ভালোই, নিরঞ্জন যত খুসি পদ্য আওড়াতে থাক্, উমার অনেক কথা ভাববার আছে। ওদের কলেজ-পিকেটিং-এ বিশেষ সুবিধে হচ্ছে না; ছেলেদের সহানুভূতি নেই, মেয়েদের তো আরো নেই। ভলান্টিয়ারি করতে যা'রা আসছে, তা'রা সব পাড়াগেঁয়ে ভূত—কিছু বোঝে না, কিচ্ছু জানে না, শুধু গাধার মত চীৎকার করতে পারে—হোক্ সে-চীৎকার বন্দে মাতরম্!—ওদের গাধাত্ব তা'তে কিছু কমে' যায় না। জীবনে কোনোদিক দিয়েই যা'দের আর কিছু হ'বার আশা নেই, তা'রাই দেশসেবা করতে আসে—অনেক স্বেচ্ছাসেবিকাকে দেখেও উমার এ-কথা মনে হয়;—উমার পক্ষে তা যতই অনুচিত হোক্ তবু হয়। খারাপ চেহারা নিয়ে নালিশ করার অবিশ্রি কোনো মানে হয় না—কিন্তু, উমার প্রায়ই মনে হয়, ওদের দলে ভালো-চেহারার মেয়ে এত কম কেন? সহজ উত্তর: ভালো-চেহারার মেয়েরা ভালো বিয়ের আশা রাখে, তাই তারা ইস্কুল-কলেজ ছাড়্‌তে চায় না; ভালো-চেহারার মেয়েদের অনেক পুরুষ-বন্ধু জোটে, তাই তা'দের দিন দিব্যি সুসিতে কেটে যায়। যা'রা 'স্বদেশী'তে আসে, ও-সব সুবিধে পায় না ব'লেই আসে। আর আসে, জীবনে যা'রা ব্যর্থ হয়েছে। মধ্য-বয়সী—এমন কি, বৃদ্ধা সব মহিলা। নিরাশ্রয়, নিষ্প্রাণ বিধবা। কিম্বা স্বামী-পরিত্যক্তা। না-হয়, স্বামী যাদের উন্মাদ কি চিররুগ্ন কি পঙ্গু। কেউ চরকার সুতো বেচে স্বামীপুত্র নিয়ে কায়ক্লেশে দিন চালায়। অনেক বয়স্কা ধর্ম্মের বদলে 'স্বদেশী'কে আঁকড়ে' ধরেছেন—দেশের দুঃখ দূর করবার জন্য নয়, নিজেদের জীবনের অসহ্য শূন্যতা

ভরে' তোল্‌বার জন্য। দেশের জন্য সত্যি অনুভব করে, সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকাবাহিনীর মধ্যে এমন ক'জন আছে? জীবনটা সুখে-দুঃখে কোনো মতে কাটিয়ে দিতে হ'লে যে-সামান্য যোগ্যতা দরকার হয়, তা-ও যা'দের নেই, তা'রা করবে দেশ স্বাধীন? না—গরীব দুঃখে উমা ভাবতে লাগ্‌লো—কোনো আশা নেই, কোনো আশা নেই। কিছু হ'বে না—যতক্ষণ দেশের সেবা লোকদেরকে না পাওয়া যায়। অমন যে-ক'জন এসেছেন, সবাই নেতৃস্থানীয়। কিন্তু কাজ যা'দেরকে দিয়ে করাতে হচ্ছে, তা'রা—অনিচ্ছাসত্ত্বে উমার মনে কথাটা জেগে উঠ্‌লো—অকথা···

বৌবাজারের মোড়ে এসে ট্যাক্সি ডান্‌দিকে মোড় ফিরলো। নিরঞ্জন তখন আবৃত্তি করছে:

Had we but world enough, and time,
This coyness, lady, were no crime.
We would sit down, and think which way
To walk and pass our long love's day.···

—তা'রা অকথা; অথচ তা'দের ওপরই সব নির্ভর করছে। নেতা আর ক'জন দরকার? যা'দেরকে নিয়ে 'সেনাবাহিনী', তা'দের মধ্যে বুদ্ধিমান, সবল, সুস্থ লোক না এলে মহাত্মা কি মতিলাল, কারো সাধ্যি নেই কিছু করতে পারেন। সেইজন্যই তো কলেজে কিছুদিন দারুণ পিকেটিং চালানো দরকার, যদিই বা দু'একজনকে পাওয়া যায়। দু' একজন! দু'একজনে কী হ'বে? তবু··· চেষ্টা করতে দোষ কী? কাল্‌কে শহরের সবগুলো কলেজ আক্রমণ করতে হ'বে। লোক দরকার। কংগ্রেসের সবগুলো শাখা-কমিটিতে আজকে রাত্রিরেই খবর পাঠাতে হ'বে—যেখানে যত লোক আছে, কেচে-কুড়িয়ে সব যেন পাঠানো হয়।···

But at my back I always hear
Time's winged chariot hurrying near:
And yonder all before us lie
Deserts of vast eternity.

উমার তীক্ষ্ণ হুকুম এলো: 'রোক্‌খে।'

সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউতে ঢুকে'ই ট্যাক্সি থেমে গেলো। আর থাম্‌লো নিরঞ্জনের আবৃত্তি।

উমা দ্রুতস্বরে বল্‌লো, 'দুঃখিত, নিরঞ্জন, কিন্তু তোমাকে এখানে নাবিয়ে দিতে হচ্ছে। এক্ষুনি আমাকে বাড়ি ফিরতে হ'বে, জরুরি কাজ। যাও।' হতবুদ্ধি নিরঞ্জনকে উমা এক-রকম ধাক্কা দিয়েই ফুটপাথে নাবিয়ে দিলো।—'চালাও—জোরসে।' গাড়ি মুখ ঘুরিয়ে বৌ করে' বেরিয়ে গেলো—সেণ্ট্রাল্ অ্যাভেনিউ দিয়ে সোজা উত্তরদিকে। নিরঞ্জন শূন্যদৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

* * * * *

পাথরের মত ভারি মন নিয়ে পরদিন সকালে নিরঞ্জন ঘুম থেকে উঠ্‌লো। কাল এক-সন্ধ্যার মধ্যে উমা ওকে কম নাকানিচুবানি খাওয়ায় নি। নিমেষে স্বর্গে তুলেছে, পরের মুহূর্ত্তেই একেবারে পাতালে—আবার সেই ধাক্কা সাম্‌লাতে-না-সাম্‌লাতেই এক হাঁচ্‌কা টানে স্বর্গে। এম্‌নি কিছুই বোঝা যায় না। যায় না? খুব যায়। জলের মত সোজা। অত সোজা বলে'ই হঠাৎ খট্‌কা লাগে। ওর বন্ধুরা—'সুকুমার সেন যা'দের প্রতিনিধি'—তা'রা কবে থেকেই তো বল্‌ছে। ফের চোখ বুঁজে' নিজের ওপর অপার করুণায় ও ডাক্‌তে লাগ্‌লো, 'নিরঞ্জন, নিরঞ্জন।' মনে-মনে নিরঞ্জন রায়ের মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে ও বল্‌তে লাগ্‌লো, 'নিরঞ্জন, তুমি সরে' পড়ো, ভুলে যাও। অনেক হয়েছে, নিরঞ্জন, আর নয়। নিরঞ্জন হায়: "shame shall be thy lot···shame shall be thy lot।" তা-ই নিয়ে তুমি থাকো, নিরঞ্জন। কারো কাছে তুমি যেয়ো না, কেউ তোমাকে চায় না, নিরঞ্জন।··· আত্ম-করুণার উচ্ছ্বাসে সকালটা ওর এক রকম কেটে গেলো। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিজকে করুণা করবার ক্ষীণ পরিতৃপ্তিও আর রইলো না; ওর মনের সব ফেনা শুকিয়ে গেলো; অনেক চট্‌কিয়েও আর নিজকে সুইন্‌বার্ণ-এর কোনো-কোনো কবিতার মত করে' তুল্‌তে পারলো না। সকালবেলা বিছানায় শুয়ে' শুয়ে' ও বার-বার আবৃত্তি করেছে:

Let us go hence and rest; she will not love.
she shall not hear us if we sing hereof,
Nor see love's ways, how sore they are and steep.

Come hence, let be, lie still ; it is enough.
Love is a barren sea, bitter and deep ;
And though she saw all heaven in flower above,
She would not love.

সাধারণত, মন ভালো থাক্‌লেই সে কবিতা আওড়ায়, কিন্তু তখন সুইনবার্ণ-এর এই বিষণ্ণ সুর ক্লোরোফর্ম-এর মত তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলো। অন্য-লোকের লেখা আওড়াচ্ছে না—সে যেন নিজেই কথা বলে' যাচ্ছে ;—তা'র মনের অবস্থা এই রকম পরিষ্কার, অবিকল করে' সে নিজে কখনো বল্‌তে পার্‌তো না। তখনকার মত, এই কবিতার সঙ্গে নিরঞ্জন এক হ'য়ে গিয়েছিলো।

কিন্তু এখন—দুপুরবেলা—সে-নেশা অনেকটা কেটে গেছে। বিষাদ দূর হ'য়ে এখন এসেচে অসুস্থ—কিছুই-ভালো-লাগে-না-ভাব। নিরঞ্জনের এ-ভাব খুব কম হয়, কিন্তু যখনই হয়, তখনি ও কতগুলো নতুন বই কেনে। কারণ, এমন মুহূর্ত্ত ওর জীবনে আসা অসম্ভব, যখন কতগুলো নতুন বই ওর হাতে এলে ওর মন একটুও চাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌বে না—সে যতই কেন bored না হোক্। বইগুলো দেখ্‌তে ওর ভালো লাগে, ছুঁতে ভালো লাগে, নতুন কাগজের গন্ধ শুঁক্‌তে ভালো লাগে, বইগুলো ওর—এ-কথা ভাব্‌তে ভালো লাগে। অসুস্থের বিরুদ্ধে ওর এ-অস্ত্র কখনো ব্যর্থ হয় না, তাই প্রয়োগ কর্‌তেও কখনো ভুল হয় না। এখনো হ'ল না। দুপুরের রোদ ওর সয় না, তবু ও টাকা নিয়ে বেরুলো—বই কিন্‌তে।

* * *

প্রেসিডেন্সি কলেজের দরজায় ভিড় জমেছে—পিকেটিং হচ্ছে। নিরঞ্জন বাস্-এর ঐ দিকে বসেছিলো বলে'ই হোক্, বা নিছক boredom থেকেই হোক্ ও-দিকে একবার না তাকিয়ে পার্‌লো না। একদল মেয়ে কলেজের গেইট্ আগ্‌লে রয়েছে—তা'দের মধ্যে উমা! মুহূর্ত্তে নিরঞ্জনের মাথায় রক্ত চড়ে' গেলো। কোথায় গেলো তা'র ক্লান্তি, কোথায় তা'র বিষাদ আর boredom! উমা পিকেটিং করে বলে'ই ও জান্‌তো, কিন্তু চোখে এর আগে কখনো দ্যাখে নি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর নাইট্ মুহূর্ত্তে সঙ্কল্প করে' ফেল্‌লো যে উমাকে এই আত্ম-অবমাননা থেকে উদ্ধার কর্‌তেই হ'বে। তাড়াতাড়ি বাস্ থেকে নাব্‌তে গিয়ে ও পড়্‌তে-পড়্‌তে নিজকে সাম্‌লে নিলো। বেজায় ভিড়; ভলান্টিয়ার, ছাত্র, পুলিশ, মজাদেখ্‌নে-ওলা। নিরঞ্জন কী করে' যে ভেতরে ঢুকে' গেলো, নিজেই টের পেলো না। উমা সবার আগে দাঁড়িয়ে হাত-জোড় করে' ছাত্রদেরকে কী-সব বল্‌ছে। অসহ্য! নিরঞ্জন চীৎকার করে' ডাক্‌লো : 'উমা!'

মুহূর্ত্তের জন্য উমার—এবং আরো অনেক—চোখ নিরঞ্জনের ওপর এসে পড়্‌লো। উমা যে ওকে চেনে, এমন-কোনো লক্ষণ সে দেখ্‌লো না। আর সব চোখ ওকে ভুলে' গিয়ে আগেকার মত চারপাশে তাকাতে লাগ্‌লো। নিরঞ্জনের আবির্ভাবে কোথাও কোনো ছাপ পড়্‌লো না ;—এক উমার পেছনে দাঁড়ানো বেলার মুখের ওপর ছাড়া। কয়েক সেকেণ্ড-এর মধ্যে বেলার মুখ প্রথমে লাল, পরে শাদা হ'য়ে উঠে,' তারপর স্বাভাবিক রঙে ফিরে' এলো। কিন্তু অত লোকের মধ্যে কেউ তা লক্ষ্য কর্‌লো না।

পিকেটিং চল্‌ছে। ছাত্ররা কেউ বাড়ী ফিরে যাচ্ছে, কেউ মজা-দেখ্‌নে-ওলাদের সঙ্গে জুটে যাচ্ছে, কেউ বা চুপ করে' অপেক্ষা কর্‌ছে—ফস্ করে' যদি এক ফাঁকে ঢুকে যেতে পারে। নবাগতরা অনেকেই তর্ক কর্‌ছে—কিন্তু সোণার মত যে মেয়ের গায়ের রঙ, আর মেঘের মত যে মেয়ের চুল, তা'র সঙ্গে কলেজের ছোক্‌রারা তর্কে এঁটে উঠ্‌তে পার্‌বে কেন? দু' মিনিটে তা'রা হার মেনে বসে। যে-ছেলেকে নিতান্তই বাগানো যায় না, উমা দু'বাহুর এক সুন্দর ভঙ্গীতে তা'র সমস্ত যুক্তি উড়িয়ে দিয়ে বলে, 'মোট কথা, যেতে পার্‌বেন না।' এ চমৎকার যুক্তির চমৎকার উত্তর আছে : 'যাবোই।' কিন্তু ষোলো থেকে কুড়ির মধ্যে যে ছেলেদের বয়েস, উমা দেবীর সাম্‌নে যে ও-কথা বলা যেতে পারে, তা তা'রা ভাব্‌তে পারে না। আসল কথা এ-ই ; যদিও এ প্রসঙ্গে 'বিদ্রোহীতে' লেখা হ'বে : 'উমা দেবীর অকাট্য যুক্তি-প্রয়োগের ফলে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের চৈতন্যোদয় হইয়াছে। তাহারা অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছে যে দেশের প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্য……' ইত্যাদি।

কুৎসিত, কুৎসিত, এক পাশে দাঁড়িয়ে নিরঞ্জন ভাব্‌তে লাগ্‌লো, ব্যাপারটা আগাগোড়া কত যে কুৎসিত. উমা তা সত্যি বুঝ্‌তে পার্‌ছে না—এ-ও সম্ভব? এই উন্মুখ প্রকাশ্যতা, হাতুড়ে ডাক্তারের মত ভিড়ের সাম্‌নে নিজকে জাহির-করা, ছেলেমানুষের মত পথ-আগ্‌লে-দাঁড়িয়ে-থাকা, ইডিয়টের মত তর্ক, যা'র শেষ কথা হচ্ছে : 'মোট কথা, যেতে পার্‌বেন না।'—মানুষের স্বাধীনতার ওপর এই অত্যাচার, যৌবনের idealism হীনভাবে exploit করা—কুৎসিত, কুৎসিত—এর ভাল্‌গারিটি অসহ্য। কিন্তু কী করা যায়? উমা ওর দিকে একবারো তাকাচ্ছে না ; এত লোকের মধ্যে নিরঞ্জনই বা কী করে' ওর কাছে এগিয়ে যেতে পারে? আর তা-ও, ওর হাত ধরে' টেনে না নিয়ে এলে ও যে ওখান থেকে নড়্‌বে, এমন মনে হচ্ছে না।……

হঠাৎ পেছনের সব লোক যেন ঠেলা খেয়ে একটা ঢেউয়ের মত ভেতরে এসে পড়্‌লো। দু' একটা চীৎকার শোনা গেলো, তারপর চক্ষের পলকে লোকগুলো সব চারিদিকে ছিট্‌কে পড়তে লাগ্‌লো ; নিরঞ্জনের পাশে যা'রা ছিলো, তা'রা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো। গোলমাল, হৈ-চৈ ; নিরঞ্জন এতক্ষণে ভাব্‌লো, ব্যাপার কী?

সঙ্গে-সঙ্গে সে ব্যাপার টের পেলো। সপাং করে' তা'র পিঠে এক চাবুকের বাড়ী পড়্‌লো। 'উহু……' নিরঞ্জন যেন মৃত্যু-যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠ্‌লো। কিন্তু সে চীৎকার তা'র মুখ থেকে না মিলোতেই সে ঘুরে' দাঁড়িয়ে দেখলো এক সার্জ্জেণ্ট লিক্‌লিকে চাবুক হাতে নিয়ে দাঁত বার' করে' হাস্‌ছে।

নিরঞ্জন ভেবেছিলো, তা'র ঘুঁষিতে সাহেবের নাক বুঝি দিব্যি উড়ে গেছে ; কিন্তু একটু পরে সে দেখ্‌লো যে সাহেবের নাক তাঁর মুখ-মণ্ডলে তেমনি শোভা পাচ্ছে, এবং তা'র দু' হাত দু'টো কনেষ্টবলের মুঠোতে আবদ্ধ। পরে, থানার কয়েদখানায় বসে'-বসে' নিরঞ্জন ভেবেছে যে আর আধ সেকেণ্ড আগে মার্‌লেই সার্জ্জেণ্টাকে আর মুখ দেখাতে হ'ত না।

এরি মধ্যে 'বিদ্রোহীর' সহকারী সম্পাদক কী করে' যেন উমার কাছে এসে চুপি-চুপি বল্‌লেন, 'পুলিশ ভিড় ভাগিয়ে দিচ্ছে। ধর-পাকড় হ'তে পারে। বি-সং-সং একটু দূরে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন, উমা কখন যে সেখানে গিয়ে উঠ্‌লো, অন্য মেয়েরাই বা কে কোথায় গেলো, কিছু বোঝা গেলো না। নিরঞ্জন ছাড়া পুলিশ আরো চারজনকে গ্রেপ্তার কর্‌লো ; তাদের মধ্যে একজন ভলান্টিয়ার, দু'জন ছাত্র, আর একজন রাস্তার লোক। নিরঞ্জন ভাব্‌লো, ঐ ভলান্টিয়ার-এর সঙ্গে যদি ওকে এক ঘরে রাখা হয়, তা হলেই ও গিয়েছে।

* * * *

নিরঞ্জনের অপরাধ, পুলিশের শান্তি-রক্ষা-রূপ-কর্ত্তব্যে বাধা দিতে চেষ্টা-করা। নিরঞ্জন বল্‌লো যে হ্যাঁ, ঐ সার্জ্জেণ্টটাকে ও ঘুঁষি তুলেছিলো, লাগে নি বলে' অত্যন্ত দুঃখিত। কারণ, লাগ্‌লে, চাবুকের বাড়ির শোধ হ'য়ে যেতো—তুলনায় তা যত কমই হোক্ না।

হাকিম বল্‌লেন যে নিরঞ্জন যদি মিঃ গর্ডার্ডের কাছে ক্ষমা চায় তা হ'লেই তিনি ওকে সামান্য কিছু জরিমানা করে ছেড়ে দিতে পারেন।

Never—নিরঞ্জন বল্‌লে—বরঞ্চ that bloody swineএরই ওর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

হাকিম বল্‌লেন, 'you must withdraw what you have said'

নিরঞ্জন বল্‌লো, 'I'll see you damned first'।

সুতরাং নিরঞ্জনের এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হ'য়ে গেলো।…

কোর্টের বাইরে অবিশ্যি শর্ব্বরী—আর বেলা। বেলা অনেক কথা বল্‌বে বলে' এসেছিলো, কিন্তু নিরঞ্জনকে দেখে ওর চোখ জলে ভরে' উঠ্‌লো, এবং বেলার চোখে জল দেখে হঠাৎ নিরঞ্জনের চোখ ফেটে কান্না আস্‌তে লাগ্‌লো। জেলখানায় এক বছর ;—শর্ব্বরীর শিশু জেলখানায় এক বছর কাটাবে। এক বছর তো দূরের কথা—সাত দিনের মধ্যেই নিরঞ্জন মরে' যা'বে ; ওর শরীর খারাপ, তায় ও একেবারে অকর্ম্মণ্য, সারাজীবন ওর আরামে, স্বাচ্ছন্দ্যে, বিলাসিতায় কেটেছে—জেলখানার কষ্ট ও কিছুতেই সহ্য করতে পার্‌বে না, কিছুতেই নয়। সাত দিনের মধ্যেই ও মরে' যা'বে, এতে ওর নিজের কোনো সন্দেহ নেই। মরতে ওর আপত্তি নেই—কিন্তু এত কষ্ট পেয়ে মরা! নিরঞ্জন

জল-ভরা চোখে শর্ব্বরীর দিকে তাকিয়ে রইলো, শর্ব্বরীর গাল বেয়ে অকপটে জলের ফোঁটা পড়ছে। বেলা আছে মুখ ঘুরিয়ে। এম্‌নি তিনজন। সময় অল্প, কোনো কথা বলা হ'ল না।···

খবর পেয়ে 'বিদ্রোহীর' সহকারী সম্পাদক সামনের সপ্তাহের জন্য লিখ্‌তে বস্‌লেন : 'পাঠকগণ অবগত থাকিবেন যে কিছুদিন পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখে পিকেটিং সম্পর্কে যে পাঁচজন যুবক গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন রায় একজন। গত বৃহস্পতিবার পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ——র এজলাসে তাঁহার এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। নিরঞ্জনবাবু ধনী ও সাহিত্যরসিক ; কলিকাতার সাহিত্য-সমাজে তিনি সুপরিচিত ! সাহিত্য-রসে মগ্ন হইয়াই তিনি জীবন-যাপন করিতেন ; বহুদিন পর্য্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল না। কিন্তু আজ এই বাণী-কমলার বরপুত্র দেশের সেবায় হাসিমুখে কারাগার বরণ করিয়া নিয়াছেন ! তাঁহার এই স্বার্থত্যাগ, এই অপূর্ব্ব দেশভক্তি, এই গৌরবময় অনুপ্রেরণা—' একটু ভেবে বিঃ-সঃ-সঃ বসিয়ে দিলেন,— 'বর্ণনার অতীত ! সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে আমাদের অভিনন্দন জানাইতেছি ! এবং যাঁহার প্রভাবে শ্রীযুক্ত রায়ের মনে এই বিপুল পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, সেই অক্লান্তা কর্ম্মিনী, ভারতবর্ষের নারীদের আদর্শস্থানীয়া শ্রীযুক্তা উমা দেবীকে আমরা বলি, 'ধন্য ! ধন্য !'—কারণ তাঁহার অসংখ্য গৌরবময় কীর্ত্তির মধ্যে নিরঞ্জনবাবুর এই পরিবর্ত্তন-সাধনও তুচ্ছ নহে !'

নিরঞ্জন কিন্তু এক বছরেও মরে' গেলো না ; বরং একটু মোটাসোটা, গাল-ভরা হ'য়েই জেল থেকে বেরুলো।

বাইরে শর্ব্বরী তা'র জন্য অপেক্ষা কর্‌ছিলো—আর বেলা। নিরঞ্জন আশা—হ্যাঁ, আশাই করেছিলো যে উমাও থাক্‌বে। কিন্তু উমাকে না দেখে সে নিজেকে খুব বেশি দুঃখিত হ'তে দিলে না। উমার কত কাজ—ওর হয়-তো সময় নেই, বা মনেই নেই। তা ছাড়া, নিরঞ্জনের কাছে না-হয় জেলে এক বছর কাটানো একটা ভীষণ কীর্ত্তি ; ও যে মরে' যায় নি, এই জন্যই নিজের প্রতি ওর কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। কিন্তু উমার কাছে তো তা জল-ভাত ; ওর সাঙ্গোপাঙ্গেরা হাসেসাই জেলে যাচ্ছে ; বেরুচ্ছে আবার যাচ্ছে। জেলে-যাওয়াতে যে কোনো কষ্ট আছে, এমন কি, বিশেষত্ব আছে, উমার তা মনে হ'বার কথা নয়। কিন্তু নিরঞ্জনের কাছে—খোলা রাস্তায় শর্ব্বরী আর বেলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ও ভাব্‌তে চেষ্টা করলো, এই এক বছর জেলখানার কোঠরি হ'য়ে ও কাটালো কী করে' ? উঃ, মানুষের জন্য মানুষ এত কষ্টের ব্যবস্থা করে ! কী খাওয়া—আর কী পোষাক, খদ্দরের চেয়েও সহস্রগুণে খারাপ। তবু তো জেইলার্‌-বাবুকে বলে' কয়ে' মাথার চুলগুলো ও ভদ্রলোকের মত করে'ই ছাঁটাতে পার্‌তো। আর কাজ—ওর শরীর দুর্ব্বল বলে' ওর কাজ ছিলো নারকেলের ছিবড়ে থেকে দড়ি বানানো—সেটাই নাকি সোজা ! হে ঈশ্বর, এ-ই যদি সোজা হয়—! কিন্তু নিরঞ্জন political prisonerও নয়—নিতান্তই সাধারণ কয়েদি ; চোর, গুণ্ডা, গাঁটকাটাদের দলের। সেই সব লোকের সঙ্গে রোজ ওর মেলামেশা ; না জানি ওর মন কত নোঙ্‌রা হ'য়ে গেছে !

কিন্তু যাক্‌ ও-সব। নিরঞ্জন প্রবল মাথা-ঝাঁকুনি দিলো—এখন আর দুঃখের চিন্তা কেন ? আবার শর্ব্বরী, ওর সেই বইয়ে-ঠাসা ঘর ; আবার সিগ্রেট্‌, আবার পরিষ্কার নরম জামা-কাপড়, নরম বিছানা, ভালো খাওয়া ; আবার সাহিত্যচর্চ্চা, আবার জীবন। এইবার ওকে নাটক লিখ্‌তে হ'বে ; একটা বছরের এমন বিশ্রী অপব্যয় হ'ল, আর গাফিলি করা চলে না। লিখ্‌তে বস্‌বে—এ-কথা মনে কর্‌তেই ওর পঁচিশ বছরের জীবনের সমস্ত উপভোগপ্রিয়তা, ওর আভিজাত্য আর কাল্‌চার শারীরিক অনুভূতির মত' ওকে আপ্লুত করে' দিলো।···গাঢ়চোখে ও শর্ব্বরীর দিকে তাকালো, পরে বেলার দিকে। জেলখানায় শর্ব্বরী কি বেলা যখন ওকে দেখ্‌তে যেতো, ঐ কুৎসিত পোষাকে দেখা দিতে নিরঞ্জনের রীতিমত লজ্জাই কর্‌তো। উমা এই এক বছরে ওকে একদিনো দেখ্‌তে আসেনি—নিরঞ্জনের মনে পড়লো—আজকে এলেও তো পার্‌তো।

কিন্তু নিরঞ্জন এখনো জানে না যে উমা এই মুহূর্ত্তে আছে পাবনাতে, কারণ সেখান্‌কার অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট ম্যাজিস্‌ট্রেট্‌ হচ্ছেন হিমাংশু গুহ, নিরঞ্জনের বন্ধু হিমাংশু, নিরঞ্জনের ব্রিলিয়েন্ট বন্ধু হিমাংশু, আই-সি-এস্‌ হিমাংশু—এবং হিমাংশু বিলেত থেকে ফিরে'-আসা মাত্র উমা তা'কে বিয়ে করেছে। অবিশ্যি এ-খবর শুনে' ওর এই মুহূর্ত্তের আনন্দ আরো বেড়ে যাবে ; কারণ এতদিনে তো উমা বুঝ্‌তে পেরেছে—পারে নি কি ?—যে নিরঞ্জন আগাগোড়া যে-কথা বল্‌ছিলো, সে-কথাই ঠিক্‌ ; নিরঞ্জনের দাবী, প্রকৃতির দাবী না মিটিয়ে যে ওর উপায় নেই, তা ও এতদিনে তো স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল—হ'ল না কি ?

সমাপ্ত

লর্ড বায়রণ

শ্রীসুনীলকুমার ধর

১৯০০ সালের হিমসিক্ত পৌষের বিষণ্ণ প্রভাত, মেঘ ও কুয়াশার আড়ালে সূর্য্য তখনও ভয়ে আত্মগোপন করিয়া আছে—পৃথিবীর জনহীন পথে মাত্র একজন পথিককে দেখা গেল। অঙ্গে সামান্য পোষাক, দেখিলে মনে হয় শীতে সর্ব্বদেহ অসাড় অবশ হইয়া উঠিয়াছে, পা যেন আর চলে না—কিন্তু তবুও তাঁহাকে যাইতে হইবে। পৃথিবীতে তাঁহার জন্যে এতটুকু স্থান নাই ! আর্ট ও সাহিত্যের দোহাই দিয়া মানুষের জগতে এতদিন অম্লান বদনে যে অনাচার ও ঘৃনীতি (?) তিনি প্রচার করিয়াছেন, সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতীক্ষাকে নগ্ন সত্যরূপে তাহাদের চোখের সামনে ধরিয়া বিশ্বাস-নির্ভর মানুষের যে বিশ্বাসকে তিনি হত্যা করিয়াছেন। নর-নারীর ভিতর গড়িয়া তুলিয়াছেন অবিশ্বাসের প্রাচীর—ভালবাসার কণ্ঠ রোধ করিতে যাঁহার বিবেক এতটুকু কুণ্ঠিত হয় নাই—তাহারই শাস্তি ভোগ করিবার জন্যে আজ তিনি নরকে চলিয়াছেন। না' বলিবার উপায় থাকিলে এমন প্রভাতে তাহাকে হয়ত কোন সুন্দরী তরুণীর সুখশয্যার অংশভাগীরূপে দেখা যাইত কিন্তু আজ তিনি যেখানে চলিয়াছেন, সেখানকার আকাশে চাঁদ ওঠে না, বাগানে ফুল নাই তরুণীর লীলায়িত দেহ, হাসি, কিছুই নাই—চারি পাশে কেবল অন্ধকার আর এই অন্ধকারের মত ছন্দহারা জীবন যাত্রা।

ক্লান্ত চরণে পথিক যখন নরকের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, চারিপাশের অন্ধকার তখনও তেমনি গাঢ়, কম্পিত হস্তে দ্বারীর নিকট প্রমাণ-পত্র পেশ করিয়া প্রবেশের অনুমতি প্রার্থী হইয়া মুখ তুলিতেই অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল—পথিক আমাদের বিখ্যাত কবি নাট্যকার অস্কার ওয়াইল্ড। আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, Salome-র রচয়িতা যে ধর্ম্মযাজক নহেন এমন কি ধর্ম্ম ও সুনীতি প্রচারের বিশেষ কোন সহায়তা করেন নাই একথা আশা করি আপনাদের স্মরণ আছে। তিনিই যে Salome-র লেখক একথা প্রমাণিত হইবামাত্রই প্রহরী ফটক খুলিয়া দিল এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার বাসের জন্য পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কুঠুরীতে লইয়া গেল।

নরকে সকল ঋতুরই প্রবেশ নিষেধ এখানে সব সময়ই অসহ্য গরম। ফটকের বাহিরে কবি ওয়াইল্ড শীতে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিলেন কিন্তু এখানে প্রবেশ করিয়াই তাঁহাকে জামা-পায়জামা সবই খুলিয়া ফেলিতে হইল।

শাস্তি-দাতা এবং তাঁহার অনুচররূপে (নরকে ইহাই বিশেষত্ব) যে ভূতটি নিযুক্ত হইয়াছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা বাপু বল্‌তে পার এখানে অতিথি-অভ্যাগত বা অন্য লোকের সঙ্গে কখন দেখা-সাক্ষাৎ করা যায় ?

অনুচর উত্তর দিল—ঠিক পৃথিবীর মতই। দুপ'রে বারোটা থেকে একটা এবং সন্ধ্যা পাঁচটার সময়—

মৃদু হাসিয়া কবি হৃষ্টচিত্তে তাঁহার অর্দ্ধউন্মুক্ত পায়জামার পকেট হইতে শেষ মুদ্রাটি বাহির করিয়া অনুচরটির হাতে দিয়া বলিলেন—দেখ, শুনেছ লর্ড বায়রণ এখানে আছেন, আমি প্রথমে তাঁর সঙ্গে দেখা কোরতে চাই, তিনি কোন্‌ ঘরে আছেন ?

অনুচর বলিল—সামনের ঐ কোণের ঘরে। হুজুর গান ভালবাসেন কিনা তাই জার্ম্মাণ কোয়াটারে ঘর নিয়েছেন।

তাহার পর ওয়াইল্ডের শাস্তির পালা। আজ হইতে প্রতিদিন তাঁহাকে একঘণ্টা করিয়া নিয়মিত ভাবে শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে। শাস্তি গ্রহণ করিতে কবিকে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত বা লজ্জিত দেখা গেল না বেশ হাসি মুখেই শাস্তি ভোগ করিলেন।

তাহার পর প্রসাধনের পালা। লর্ড বায়রণ সৌখীন মানুষ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলে বেশ ভব্য হইয়াই যাওয়া উচিত। তিনি প্রথমে ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করিলেন, হাতের নোখগুলি একটি একটি করিয়া কাটিলেন এবং তাহার পর জুতার পালিশ দিয়া সেগুলি বেশ ঝক্‌ঝকে

করিলেন (এখানে কোন রকম cold cream বা Snow দেওয়ার রীতি নাই)। Styx-এর জলে কোন রকমে স্নান সারিয়া এক ঘণ্টা ধরিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানাভাবে cravat-টি গলায় জড়াইলেন। সমস্ত দেহ আদল নিম্নাঙ্গের কথা নাই বা বলিলাম। (এখানে পরিচ্ছদের মধ্যে নিজের পছন্দমত একটি মাত্র জিনিষ ব্যবহার করিতে পারা যায়, cravat-এর উপর ওয়াইল্ডের বরাবরই ঝোঁক বেশী, তাই তিনি শুধু ঐটিই ব্যবহার করিবার অনুমতি পাইয়াছেন)।

ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিবা মাত্রই ওয়াইল্ড দরজার গায় লাগানো নিজের রক্তে লেখা কালো হাড়ের কার্ডখানি লইয়া লর্ড বায়রণের সঙ্গে দেখা করিবার জন্যে বাহির হইয়া পড়িলেন। অদ্ভুত বলিয়াছিল—ঐ মোড়ে লর্ড বায়রণ থাকেন কিন্তু রাস্তায় বাহির হইয়া ওয়াইল্ডের মনে হইল এ অন্ধকার পথের বুঝি আর শেষ নাই। এত অন্ধকার, আলো ত ভয়েই প্রবেশ করে না বাতাসেরও যেন কণ্ঠরোধ হইয়াছে!

দুই পা আগাইয়া গিয়াই কারণের (Charon) (ভব-পারের খেয়ার মাঝি) সঙ্গে দেখা, সে তখন পাগ্‌লা সারবারাসকে (তিন মুখো কুকুর) লইয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। সেই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লর্ড বায়রণের ঘর দেখাইয়া দিল। বায়রণের ঘরখানি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, রাস্তার দিকে ছোট একটি কালো জানালা, জানালাটা খোলা। অতি সন্তর্পণে ওয়াইল্ড ভয়ে ভয়ে একবার জানালা দিয়া ভিতরের দিকে তাকাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন বায়রণ কি করিতেছেন এবং এখন প্রবেশ করা যায় কিনা।

দেখিলেন তাহার পূর্ব্বেই বায়রণের ঘরে আর একজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং বায়রণের সাম্‌নে মুখোমুখি হইয়া বসিয়া আছেন। অনেকক্ষণ ঠাহর করিয়া দেখিবার পর চেনা গেল তিনি আমাদের প্রেমিক কবি শেলী। মাথায় কেবল মাত্র একটি Straw-hat আর বায়রণ নিজের খোঁড়া পা খানি লুকাইবার জন্যে ধূসর বর্ণের একজোড়া top-boots পরিচয় বসিয়া আছেন। দু'জনের মাঝখানে একখানা আবলুস্ কাঠের টেবিল এবং টেবিলের নীচে পরস্পরের পায় পা জড়ানো। শেলীর মুখে একটি রাঙা সিগ্রেট্ আর বায়রণ প্রকাণ্ড একটা ফ্লাস্ক হইতে fire water পান করিতেছেন। ভিতরে বায়রণ ও শেলী তখন কি সব আলোচনায় ব্যস্ত, ওয়াইল্ড কোন বাধা না দিয়া জানালার নীচে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন।

বায়রণ বলিলেন—তুমি যাই বলো না কেন, পার্সি, ভগবানের (?) পৃথিবীতে ইংরেজের মত লম্বাড় জাত আর নেই। তারা আমাদের কি বিরক্তই না কোরেছে—এ জায়গায় এত গরম না হ'লে মনে হোত পৃথিবী ছেড়ে বুঝি কোন স্বাস্থ্যনিবাসে এসেছি। নানা ছলে বলে পৃথিবীর চারিপাশ থেকে অর্থ নিয়ে এসে তারা কি করে বলো দেখি? —কতকগুলো সাবান, কলকব্জা আর কাপড়, এই ত ওদের সভ্যতা! ছোঃ! এবং দিন দিন ওরা এত বাড়িয়ে তুলছে যে লোকের কাছে মুখ দেখানো ভার হয়ে উঠ্‌ছে। (যেমন Horace Tibullus) সেদিন ক্লাবে ovid বিনিয়ে বিনিয়ে বল্লে "আজকাল তোমরা এত ধনী হয়েছ যে আমরা তা কখনও কল্পনা ক'রতে পারি নি। তখনই আমার ম্যানচেষ্টারের কথা মনে পড়ে গেল—এবং উত্তর দেবার মত একটা কথাও খুঁজে পেলাম না। আমি তোমাকে বলছি, ভাই, ইংরাজরা দিন দিনই অধঃপাতে যাচ্ছে এবং শেষ পর্য্যন্ত সম্বল বল্‌তে Carthage-এর Hannibul-এর মত সেক্সপীয়ার ছাড়া আর কিছু থাকবে না।

—তুমি কি বল্‌তে চাও বুঝিছি, কিন্তু, সত্যিই অর্থের কারাগারে ওরা আটকে বন্দী কর্‌েছে। লণ্ডন সহরে তুমি হাসেসাই দেখতে পাবে খেতে না পেয়ে তুলী-শিল্পী হ'য়েছ মজ্জাকর—কবি হ'য়েছ সাংবাদিক। এই দেখনা, আমি, যখন আমার প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত করি, অভিজাতদের সে কি নাক সিঁটকুনি!! কবিতা লেখার চেয়ে বড় অপরাধ আর নেই, তার উপর আমার মত অভিজাতদের কবিতা লেখার চেয়ে নীচু কাজ নাকি আর নেই!! মত' রাগ কোরে বল্লেন—'But surely that's what school masters are for!'—আশ্চর্য্য!! তারপর আমি যখন আমার প্রথম নাটক Manfred প্রকাশিত করি, Duke of Devonshire আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠে আমাকে সতর্ক করবার জন্যে করুণা বশবর্ত্তী হ'য়ে লিখলেন—'Poor old fellow! Think of you

immortal soul before you become a *souffleur*! সেই দিনই গ্যেয়টের একখানা চিঠি পেলাম, লিখেছেন—'আপনাকে লিখ্‌তে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। সেইক্‌স্‌পীয়ারের দেশে আপনার নাট্যপ্রতিভা একদিন তার যথাযোগ্য সম্মান পাবেই।'

—কিন্তু একটা থিয়েটারও নিলে না! যাক্ গে—তার জন্যে দুঃখ নেই, ভাই। কিন্তু ইংরেজদের থিয়েটারের পক্ষে কিছু বলার আগে থিয়েটারগুলোর অবস্থাটা একবার ভাব দেখি। কি আছে? ইংরেজের থিয়েটারে latest আমদানী কি? – তিনরকম কৃত্রিম সূর্য্যের আলো আর ষ্টেজের উপরে resfrigerator-এ তৈরী অকৃত্রিম (?) বরফ। এইত! * * সেদিন অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে হ্যামলেট যখন Elsinore এর ছাদে এসে দাঁড়াল—চারপাশে তখন বরফ পড়তে আরম্ভ কোরেছে। অভিনয় হয়ত খুব খারাপ হয় নি কিন্তু অভিনয় বন্ধ হওয়ার পর অভিনয়ের এমন কি হ্যামলেটের দাঁড়াবার ভঙ্গীটুকু পর্য্যন্ত প্রশংসা না কোরে তারা বরফ পড়ার প্রশংসা কোরতে লাগল। তারপর রাজপুত্র মারা গেছেন, অস্পষ্ট অন্ধকারে তাঁর মৃতদেহ পড়ে' আছে—মুখের উপর ফিঁকে নীল আলো এবং হাতের উপর লাল আলো এসে পড়েছে, তাঁর চোখ দুটি উপরের ছাদের দিকে নিবদ্ধ। চারিপাশে অখণ্ড নীরবতা। কিন্তু সে সময় কেউ যদি সেইক্‌স-পীয়ারের কবরের উপর কান পেতে শুন্‌ত—শুন্‌তে পেত কবরের ভিতর সেইক্‌স্‌পীয়ার তাঁর রাজপুত্রের এই অপমৃত্যু দেখে গুমরে উঠে তিনবার পাশ ফিরে শুলেন। এইত অভিনয় -আর এইত দর্শক!! ওদের আজকালকার প্রত্যেক নূতন নাটকই হয় নানা রঙ্ বেরঙের সাজ-সজ্জা ও দৃশ্যপটের জন্যে কিংবা 'props'দের জন্যে লেখা। তা ছাড়া লণ্ডনের কোন থিয়েটারের জন্যে নাটক লিখবার পূর্ব্বে আজ কাল নাকি নাট্যকারকে বছর দুই কোন বাজীকরের সহকারীরূপে কাজ কোরতে হয়, এ অভিজ্ঞতা যার নেই লণ্ডনের কোন থিয়েটার-অলা তার নাটক নেবে না। তাই ইংলণ্ডের বর্ত্তমান কবিরা প্রতারক, কেবল চালের উপরই চলেছে—সত্যিকারের কবিপ্রতিভা কারও নেই। এমন কি সাম্‌নের জানালার নীচে যে আইরিশ বকধার্ম্মিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুন্‌ছে, ও-ও বাদ যায় নি। ও এমনি মর্য্যাদাহীন যে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরিবর্ত্তে জেলে যাওয়াই শ্রেয় মনে কোরেছিল। ভীরু!!

—এই বলিয়া লর্ড বায়রণ হাথি মারিয়া অর্দ্ধ উন্মুক্ত দরজা খুলিয়া ফেলিলেন এবং cravat ধরিয়া ভীত ওয়াইল্ডকে ঘরের ভিতর টানিয়া আনিলেন।

কবিদের মধ্যে বায়রণের মত এতবড় মেজাজী ও খেয়ালী খুব কমই দেখা গেছে, ওয়াইল্ডেরও একথা অজানা ছিল না তাই রাইরণের ব্যবহারে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। কি জানি এখানে আসিয়াই বা কি কপালে আছে!

বায়রণ ওয়াইল্ডের মুখের অবস্থা দেখিয়া হাসিয়া বলিলেনে, ভয় নেই বন্ধু। Garrick-এর ঘরের গায় রাঙা ছায়া দেখেই বুঝেছিলাম তুমি আস্‌ছ, যাক্ শেষ পর্য্যন্ত তুমি যে আমাদের দলে এসেছ এ দেখে খুব সন্তুষ্ট হইছি।

তাহার পর শেলীর দিকে ফিরিয়া ওয়াইল্ডের পরিচয় দিয়া বলিলেন—এঁর-নাম তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ, ড্যাবলিন বাড়ী—এঁর লেখা Salome আমি তোমাকে গত ১লা এপ্রিল উপহার দিয়েছিলাম। বইখানা খুব খারাপ নয়, কি বলো?

ওয়াইল্ডের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—দাঁড়িয়ে কেন, বসো, বসো। সিগ্রেট্ খাবে—মদ? সত্যি এখানকার মদ সিগ্রেট্ চমৎকার! আঃ তোমার আবার সেই ধর্ম্মের ফ্যাকামী আছে, জেলে গিয়ে তুমি একেবারে অধঃপাতে গেছ দেখছি—,

* *সন্ধ্যার সময় দেখা কোরে দু'জনে একসঙ্গে Disagreeableএর ক্লাবে যাওয়া যাবে। ক্লাবটি অন্তর্জাতিক, সেখানে তুমি অনেকের দেখা পাবে—Beranger, Heine Aristophanes, Poe, Goldoni। প্রতিদিন সেখানে আমরা পরস্পরের জীবন-কাহিনী বলি তারপর বন্ধু Schumann গান করে। গানে-গল্পে সময়টা মন্দ কাটে না কিন্তু হাসি একেবারে বন্ধ।

—সেইক্‌স্‌পীয়ারের সঙ্গে যদি দেখা কোরতে চাও ওধারে মাঠের দিকে গেলেই তাঁর দেখা পাওয়া যাবে। প্রতি সন্ধ্যায় ঐ মাঠে হোমার ও লি-তাই-পে-র সঙ্গে তিনি বেড়ান। বড় কাব কিনা—এ সব atmosphere তাঁর সহ্য হয় না!!

—ঠিক্ ঠিক্, সন্ধ্যার সময় তোমার সঙ্গে ত' দেখা হবে না, ভুলেই গিয়েছিলাম যে Bavaria-র রাজা Ludwig II

এর ওখানে আমার dinner-এ নেমন্তন্ন আছে। রাজাকে তুমিও ত চেন হে। বেশ অমায়িক লোক, তাঁকে আজ সন্ধ্যায় *Don Juan*-এর ১৭-র Canto পড়িয়ে শোনাবার কথা। ওটুকু এখানে এসেই লিখিছি। স্বয়ং সয়তান কেইনের অংশে অভিনয় কোরবে। তুমি ত এখন এখানেই আছ—ক্রমে ক্রমে সকলের সঙ্গেই তোমার আলাপ করিয়ে দেব।

আচ্ছা—

একটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই করমর্দ্দন করিয়া ওয়াইল্ড উঠিয়া আসিলেন।

শেলীকে দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসিয়া বায়রণ নিজের লেখা হইতে বাছা বাছা লাইন খুঁজিতে লাগিলেন (যাহা আর বদল করা চলিবে না), এই তাঁহার শাস্তি। *

সে-সাধনা আমার কি সয়

শ্রীকুমুদ ভট্টাচার্য্য

কেমনে বাসো যে ভালো একান্ত এ নিঃসঙ্গ জীবন,
কী-আনন্দ পাও বন্ধু, রাত্রিদিন সেবি' নির্জ্জনতা ?
একনিষ্ঠ ব্রত তব—তাহারে সম্ভ্রম করে মন,
তবু হায়, নাহি বুঝি—সত্য কি আনন্দ আছে তথা !

কঠোর সাধনা তব—তা'রে নাহি করি অস্বীকার,
বিজয়লক্ষ্মীর মালা হয় তো বা রয়েছে সঞ্চিত
হে বন্ধু, তোমারি তরে ; নিও তা'রে করি' কণ্ঠহার !
তথাপি তোমার পথ—আমার তো নহে সে বাঞ্ছিত।

দু'দিনের নিঃসঙ্গতা নিঃশেষে উন্মাদ করে মোরে,
নিঃশ্বসিয়া ওঠে প্রাণ—কোথা বিন্দু নিঃশ্বাসের বায়ু !
কেন এই বন্ধগৃহ—অন্ধকার—কোথা আলো ওরে ?
কোথা প্রিয় পরিজন—প্রিয়তমা—আরেকটু আয়ু ?

বাড়াই ব্যাকুল বাহু !—সহসা বিদারি' কক্ষ-কোণ
আলোর ঝালর রাশী, উন্মুক্ত উদার মিঠে হাওয়া
চির-চেনা বন্ধু-সম মোরে করে মুগ্ধ সম্ভাষণ !—
হে বন্ধু, তোমার পথে ইহাদের কোথা দাবী দাওয়া ?

বাঁধিয়া প্রিয়ারে মোর মুখখানি এনে রাখি বুকে,
কী-তৃপ্তি বাহুর বন্ধে—তোমারে কেমনে তাহা কহি ?
প্রিয় প্রিয়তম স্বামী—প্রিয়া মোর ব'লে চলে সুখে,
হে বন্ধু, আমার সাধ—আজীবন এই পথে রহি !

আমারে করিও ক্ষমা—আমি বন্ধু চলি ভিন্ন পথে,
তোমার সাধন-পথে আমার যে চলা নাহি হয় !
প্রাণ যা'রে নাহি চায়—তা'রে বল' বরি কোন্ মতে ?
একান্ত দুর্ব্বল আমি !—ও-সাধনা আমার কি সয় ?

* Herbert Eulembery. অনুসরণে।

সার্থক সম্ভাবনা

শ্রীবিমলা দেবী

তুমি শুধু দিয়েছিলে আনি' বসন্তের দুরন্ত উচ্ছ্বাস,
আমি এঁকেছিনু তারি' 'পরে স্বপনের গোপন আভাস।
ঝরে'-পড়া শেফালির বুকে
হেরিয়াছি আনন্দ-কৌতুকে ;
প্রভাতের জাগরণী-সুরে রাঙায়েছি সুদূর আকাশ,
তুমি শুধু এঁকেছিলে ছবি, আমি তা'রে করেছি প্রকাশ।

গগনের দূর নীহারিকা কী লিপিকা এঁকে দিয়ে যায়,
শ্রাবণের সজল বাদল ঘন নীল কোন্ বেদনায় !
সে কাহিনী আমারি শ্রবণে
উঠে বাজি' মৃদু সমীরণে
মর্ম্মরিত উতলা কানন আনমনে কা'র পথ চায়।
তুমি শুধু এনেছিলে গান, আমি সুর দিয়াছি যে তা'য়।

নির্ঝরের চঞ্চল চরণে বাজি' উঠে কোন্ আকুলতা—
ধরণীর স্তব্ধ মূক বুকে যুগে যুগে নিদ্রিত বারতা।
আমারি বক্ষের তলে আসি',
বার বার কহে সে নিঃশ্বাসি,
হেমন্তের কুহেলি আননে মুগ্ধ মন শোনে ব্যাকুলতা।
সম্ভাবনা এনেছিলে তুমি, আমি খুঁজে পেয়েছি সে-কথা।

আকাশ ও সমুদ্র

শ্রীজগৎ মিত্র

একখানা চিঠি পেলাম। অনিল দা' অফিস থেকে লিখে পাঠিয়েছেন,—ভাই, তড়িৎ, আমার অফিসের এক বন্ধুর ভয়ানক অসুখ। আজ রাত্রে তা'র কাছেই আমাকে থাক্‌তে হ'বে। তোমার বৌদিকে খবরটা দিও, নইলে সে ভাব্‌বে। সে ছেলেমানুষ বাড়ীতে রইলো একা। পার তো তুমি আজ রাতে আমাদের ওখানেই শুয়ো। যদি একান্ত অসুবিধে হয়, আমাদের ঠিকে ঝি-টাকে আজ রাতে বাড়ী যেতে বারণ ক'রো।—অনিল দা'।

সামান্য একখানি চিঠি। কিই বা ছিল তা'তে? অতি সাধারণ একটু অনুরোধ। তবু কেন যে হাত পা ঠাণ্ডা হ'য়ে এলো জানিনে। একটি কুড়ি বছরের তরুণীকে পাহারা দেবার জন্যে একটি একুশ বছরের তরুণের কাছে অনুরোধ এসেছে। এর মধ্যে বিস্ময়ের বস্তু আছে নাকি? তবু কাঁপ্‌ছিলাম। সে ভয়ে না আনন্দে? জীবনে এতোটা 'নার্ভাস্' আমি কোনদিন হইনি।

তা' সুন্দরী বই কি! লক্ষণ দেওর তো নই যে চোদ্দ বছর বৌদির পা দেখেই কাটাব'। প্রতিমার মুখের দিকে তাকিয়েছি। তাকে দেখ্‌তে ভাল লাগে। ফুল দেখতে ভাল লাগে আর যতো লজ্জা বুঝি সুন্দর ছেলে বা মেয়ের দিকে চাইতেই! প্রতিমার রূপ আছে, আমিও নেহাৎ কুশ্রী নই—অনেক মেয়ে লুকিয়ে আমায় দেখে। প্রতিমাও আমায় দেখে খুশী হয়, আমার সঙ্গে কথা বলে' আনন্দ পায়।

তবে কি আমি প্রতিমার প্রেমে পড়েছি? না বোধ হয়! প্রেমে পড়লে মানুষের কি রকম অবস্থা হয় জানিনে। উপন্যাসে যেমনটি লেখে তেমন দশা আমার নয়। আমাদের দেশে কটা ছেলে-মেয়েরই বা প্রেমের অভিজ্ঞতা আছে? সুতরাং প্রতিমাকে ভালবাসি কিনা কেমন ক'রে বুঝ্‌বো?

ভাব্‌ছি অনিল দা' আমাকে এতোখানি বিশ্বাস করলেন কি ক'রে? তিনি কি আমায় নেহাৎ ছেলে মানুষ ভেবেছেন? যতোই হোক্ আমি বি-এ পড়ি, আমার রূপ আছে এবং বয়সে আমি অন্ততঃ তাঁর চেয়ে ১১।১২ বছরের ছোট। আমি গান গাইতে পারি, কবিতা লিখ্‌তে পারি এবং মেয়েদের সঙ্গে মিশে বড় বাজারে Picketing করতেও পারি। এতো জেনে শুনেও তিনি তাঁর তরুণী স্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

আমাকে তিনি তাঁর বাড়ীতে প্রত্যহ ধ'রে নিয়ে যান, নিমন্ত্রণ ক'রে মাঝে মাঝে খাওয়ান। এ ছাড়া আমাকে প্রায়ই গান গাইতে হয়, কবিতা পড়তে হয় এবং তাঁ'র তরুণী ভার্য্যাটিকে একটু আধটু সেতারও শেখাতে হয়।

আমি প্রতিমার নিজের দেওর নই দূর সম্পর্কেরও না। অনিল বাবুর সঙ্গে পরিচয় হোল' হঠাৎ। চাকরিতে বদলি হয়ে তিনি যেদিন আমাদের সহরে সস্ত্রীক উপস্থিত হলেন সেদিন এখানে তাঁর পরিচিত বল্‌তে কেউ ছিল না। অপরিচিত স্থানে ভদ্রলোকের অসহায় অবস্থা দেখে তাঁ'র গৃহ-প্রবেশের প্রারম্ভে, আমি তাঁকে কিছু সাহায্য করেছিলেম। আমার প্রতি প্রথমে তাঁর ছিল কৃতজ্ঞতার ভাব। তার পর নিত্য আলাপ পরিচয়ের মধ্যে সেটি বন্ধুত্বে পরিণত হোল।

লোকটি বিশেষ মিশুক নন। এ সহরে আমিই তাঁর প্রথম ও শেষ বন্ধু (যদিও তিনি আমার থেকে যথেষ্ট বড়)। তারপর যেদিন তিনি আবিষ্কার করলেন যে আমি গান গাইতে পারি, কবিতা লিখ্‌তে পারি, সেদিন থেকে আমার প্রতি তাঁ'র স্নেহ বেড়ে গেলো।

ভদ্রলোকের সাহিত্য-প্রীতি অসাধারণ। এতো দিন সাহিত্য-চর্চ্চা ক'রে ঘরে বাইরে অবজ্ঞাই কুড়িয়েছি, এই প্রথম সহানুভূতি পেলেম। আফিসের ফেরৎ অনিলবাবু রোজ আমাকে তাঁ'র বাড়ীতে ধরে' নিয়ে যেতেন। তারপর চলতো পড়াশুনো, গান বাজনা-গল্প। বলা বাহুল্য প্রতিমাও সময় পেলেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিতো। তাঁ'র লঘু হাস্য-পরিহাস্ সরলতা আমাদের অলস ক্লান্ত সন্ধ্যাটিকে মধুর ক'রে তুল্‌তো।

প্রতিমার মধ্যে কি ছিল জানিনে। তাঁ'র আবির্ভাবে আমার চারিদিকে একটি সুন্দর সংযত মাধুরী ছড়িয়ে পড়্‌তো। নিজের মধ্যে এমন একটি মধুর মাদকতা অনুভব কর্‌তেম যা' সন্ধ্যার প্রহরগুলি অতিক্রম করেও নিশীথ রাতের নিঃসঙ্গতার মধ্যে আমাকে আবিষ্ট করে তুল্‌তো।

আমি ভয় পেলাম। কেন জানিনা পড়াশুনায় তেমন আর মন দিতে পারিনে। স্বপ্নের মধ্যে আমার দিনগুলি কাটে। তবে কি আমি প্রতিমাকে ভালবাস্‌তে সুরু করেছি? আমি কি তা'কে মন্দ চোখে দেখি? মন বলে, ছি, ছি!

আসল কথা, আমার একুশ বৎসরের জীবনে প্রতিমাই প্রথম নারী-সম্বন্ধে আমার মধ্যে একটি সশ্রদ্ধ অনুভূতি জাগিয়ে দিল। এর আগে আমি মেয়েদের সঙ্গে অনেক মিশেছি কিন্তু নারীর সঙ্গে নয়। নারীত্বের সঙ্গে পরিচয় এই আমার প্রথম। প্রতিমাকে অতিক্রম করেই নারীর একটি মানসী মূর্ত্তি আমার মধ্যে জেগে উঠ্‌লো।

অথচ প্রতিমার মধ্যে অসাধারণ এমন কিছু নেই। প্রত্যেক মেয়ের মধ্যে বিশেষ করে' বাঙলা দেশের মেয়ের মধ্যে যে গুণগুলি খুব মানায় তার মধ্যে সে-সব গুলিই ছিল। নারীসুলভ লজ্জা তার মধ্যে ছিল কিন্তু মিথ্যা সঙ্কোচের দৈন্য ছিল না। সে মাথায় কাপড় দিত কিন্তু ঘোমটা দিত না।

প্রতিমা পুরুষকে সম্মান করে কিন্তু ভয় করে না। তা'র হাস্য পরিহাসের মধ্যে এমন একটি সহজ সংযম থাকে যাতে ক'রে মানুষটি কিছুতেই ছোট হয় না। অথচ শ্রোতাকে আকৃষ্ট করেই।

প্রতিমার পাশে অনিলদা'কে আদৌ মানায় না তবু এঁদের দাম্পত্য-জীবন যে খুবই সুখের তা' দেখলেই বোঝা যায়। পরস্পরের প্রতি এঁদের প্রগাঢ় ভালবাসা কিন্তু সে ভালবাসার মধ্যে উচ্ছ্বাস নেই।

অত্যন্ত নীরস শুক্‌নো চেহারা, যথেষ্ট বয়সের পার্থক্য এবং সামান্য কেরাণীর অবস্থা সত্ত্বেও অনিলবাবুর মধ্যে এমন কিছু আছে যা'র দরুণ তিনি যে-কোন মেয়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ কর্‌তে পারেন।

আমার মনে হয় সেটি তাঁর গভীরতা। বাক্যে চিন্তায় কার্য্যে সর্ব্ববিষয়েই তিনি গভীর। মেয়েদের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। "কামিনী, রমণী, মোহিনী" প্রভৃতি নারীর সম্মান-সূচক নামগুলি তিনি মুখে উচ্চারণ কর্‌তে পার্‌তেন না। তাঁ'র দু'একটি সুন্দর অনুভূতির কথা আজো আমার মনে আছে। তিনি বল্‌তেন—জোর ক'রে কখনো কারুর ভালবাসা আদায় করা যায় না।···মানুষের সবটুকুই পশুত্ব নয়। তা'র মধ্যে যেটুকু পশুত্ব তাই দিয়ে প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়ে নেয়, বাকিটুকু দিয়ে স্বর্গ রচনা করা চলে।···

প্রতি সন্ধ্যায় এমনিধারা নানা বিষয়ে তাঁ'র সঙ্গে আলোচনা চল্‌তো। প্রতিমা চুপ ক'রে শুন্‌তো, বল্‌বার থাক্‌লে নিঃসঙ্কোচে তা'র মতগুলি প্রকাশ করতো। একদিন সে একটি চমৎকার কথা বলেছিল—সতীত্বের মধ্যে অধিকাংশ নারীর গৌরব করবার কিছুই নেই। আমাদের দেশে ওটা ঠিক রূপণের সোণার তালের মতো, কোনদিন কাজে এলো না, মাটিতে চাপাই রইলো। পরীক্ষার মধ্যে না পড়লে সতীত্বের বাছাই হ'বে কেমন করে? আগুনে না পোড়ালে সোণাকে চেনা যায় না। কে যে সতী কে যে অসতী বাইরে থেকে বল্‌বার যো নেই। এমন কি দৈহিক এবং মানসীক সতীত্ব দুটো একেবারে আলাদা জিনিষ।

এই সব আলাপ আলোচনা থেকে বোঝা যায় প্রতিমার স্বামীভাগ্য ভালই। আর যাই হোক্ স্বামী তা'কে ভুল বুঝবেন না এটা ঠিক। সুতরাং অনীলবাবু কেন যে তাঁ'র স্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন তা'ও স্পষ্ট হোল'। স্ত্রীকে তিনি সর্ব্ববিষয়ে মুক্তি দিয়েই বেঁধে রাখতে চান।

অনীলবাবু আমাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করেন বটে কিন্তু আমি তা'র কতোটা উপযুক্ত সেই কথা মাঝে মাঝে ভাবি। বিশেষ করে আজ চিঠিটি পাবার পর থেকে মনে শান্তি নেই। মনে কোন গলদ নিয়ে প্রতিমার সঙ্গে মেশা যাবে না সেকথা মিথ্যা নয়।

কিন্তু আমার মধ্যে গলদ আছে কি? কিছুক্ষণ আগে আমার বুক কেঁপেছিল সেটি কোন্ শ্রেণীর দুর্ব্বলতা? মন প্রবোধ দিল, সে দুর্ব্বলতার কারণ প্রেম নয়, সামাজিক ভীতি। অপবাদ জিনিষটাকে কে না ভয় করে? পরস্ত্রীর সঙ্গে মেলা মেশা কোন সমাজই সহ্য করে না। পাড়ার লোকে যদি শোনে স্বামীর অনুপস্থিতেও আমি প্রতিমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করি তাহলে কথাটা কেমন দাঁড়াবে?

নিজের দুর্ব্বলতার একটা কারণ পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। মন একটা বাঁধা রাস্তায় চল্‌তে লাগলো। এতোক্ষণ সে নানা সম্ভব অসম্ভবের রাজ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিলো। প্রথমে প্রতিমার কাছে যেতে সঙ্কোচ বোধ করেছিলাম পাছে সে মনে করে তা'কে একলা পাবার জন্যে আমি কোন সুযোগ খুঁজেছি। কিন্তু এখন মনে হোল' সে কথা মিথ্যে। রাতে যদি ওবাড়ীতে থাকি সে একমাত্র অনিলদার অনুরোধেই আমার নিজের কোন অভিপ্রায় নেই। খানিকটা সাহস পেলাম প্রতিমার কাছে যেতে।

তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। চিঠিখানি নিয়ে অনিলদার বাড়ীতে কড়া নাড়তেই প্রতিমা দরজা খুলে দিলো। হেসে বল্‌লো—এই যে এসো ঠাকুরপো। এতো দেরি হোল' যে? তোমার না আজ সকাল সকাল আস্‌বার কথা ছিল? আচ্ছা, উনি এখনো এলেন না কেন বলতো?

বুকটা একটু কেঁপে উঠলো কিন্তু সাহস সঞ্চয় করে' বললাম—আজ অনিলদা' আস্‌তে পারবেন না, বৌদি। আমাকে একখানা চিঠি পাঠিয়েছেন।

— কেন? কি লিখেচেন?

প্রতিমার হাতে চিঠিখানি দিয়ে বল্‌লাম—পড়ে দেখ। প্রতিমা ভিতরে গেল। আলোর সামনে চিঠিটি ধরে' পড়লো তারপর উদ্বেগের সঙ্গে বললো—কা'র অসুখ করেছে তা'তো কিছু লিখলেন না? তুমি চেনো তাঁ'কে?

সংক্ষেপে বল্‌লাম—না। আফিসের কে এক বন্ধুর। প্রতিমা সহজ ভাবে বল্‌লো—তাহলে তুমি কখন আস্‌ছো, ঠাকুর-পো? রাতে তুমি এখানেই খাবে, কেমন? না, বোলনা, লক্ষ্মীটি।

—বৌদি, তোমার ঝি কি চ'লে গেছে?

—সেতো অনেকক্ষণ আগে গেছে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে আবার কোন্ কালে থাকে? সাত বাড়ী কাজ ক'রে বেড়ায়। কেন, তোমার কিছু দরকার আছে নাকি?

—না, আজ রাতে না হয় সেই থাক্‌তো এখানে।

—কেন? তোমার কি আপত্তি আছে কোন? মাকে বলেই এসো না হয়।

—সে জন্য নয়, তবে বাড়ীতে তো কেউ নেই তাই!··· প্রতিমা বিস্ময়ের সুরে বল্‌লো,—বাড়ীতে কেউ নেই বলেই তো তোমাকে বলা। সে কথা তো তোমার দাদাও জানতেন, তবে তোমাকে আস্‌তে বল্‌লেন কেন? তুমি যদি অসুবিধে বোধ করো আমি একলাই থাক্‌বো ঝিয়ের দরকার হবে না।

—রাগ ক'রো না বৌদি, কিন্তু পাড়ার লোকদের তো জান? যদি শোনে দাদা বাড়ীতে নেই।···

—ওঃ তুমি বুঝি তাই বল্‌ছো? পাড়ার লোকদের আর জানিনে? একটু গান গাই ব'লে কতো কথা ওঠে। কিন্তু তুমিও তা'দের ভয় কর্‌বে? লোকের ভয়ে চল্‌তে গেলে সংসারে কিছুই তো করা যায় না, তড়িৎ দা। দুর্গামি আর কিসে নেই বলো? ভালতেও আছে, মন্দতেও আছে। দুর্গামি কি কেবল তোমার একলারই—আমার নয়, আমার স্বামীর নয়? কিন্তু যা' মিথ্যে তা'কে স্বীকার ক'রে নিজেকে ছোট কর্‌বে কেন? তুমি না পুরুষ মানুষ! মেয়েদের সঙ্গে মিশে তুমি নাকি স্বদেশী করো! সামান্য দুর্গামের ভয়ে তুমি যদি পেছিয়ে পড়ো তবে মেয়েরা এগোবে কেমন ক'রে? পাড়ার লোককে ভয় করবে কেন? ভয় যদি কর্‌তে হয় নিজেকেই ক'রো। পরের দোহাই দিয়ে নিজেকে ঠকিও না।···

প্রতিমার শেষ কথাটায় চম্‌কে উঠলাম। তা'র মধ্যে কোন প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল কিনা কে জানে।

বল্‌লাম—তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে, আমারো নেই, বৌদি। ভেবেছিলাম, তুমি কি না কি মনে কর্‌বে তাই···!

প্রতিমা স্বর বিকৃত ক'রে বল্‌লো—ঢের হয়েছে আর বীরত্ব দেখিয়ে কাজ নেই। এমনি সাহস নিয়ে তুমি মেয়েদের সঙ্গে মেশো? আমার মনে হয় তুমি এখনো আমাদের আপনার ভাব্‌তে পারো নি। যদি পার্‌তে পাড়ার লোকের দোহাই কখনো দিতে পার্‌তে না! যাক্' এখন ভয় গেছে তো?

রাস্তায় নেমে মনে হোল' কে যেন 'চাব্‌কে' দিয়েছে। প্রতিমার কাছে এতো ছোট হ'য়ে যাব ভাবিনি। আবার আজ রাতেই তার সাম্‌নে যাব কি ক'রে? মেয়েদের সঙ্গে কেমন ক'রে ব্যবহার কর্‌তে হয়, আজো তা' আমার শেখা হয় নি। ঠিক কর্‌লাম প্রতিমার সঙ্গে এবার থেকে খুব সাবধানে কথাবার্ত্তা কইতে হ'বে। নিজের ভীরুতা বা সাহস

কোন মতেই প্রকাশ কর্‌বো না। উদাসীনের মতো থাক্‌বো। সে যা' বল্‌বে তাই কর্‌বো। এরা কিসে যে আহত বা খুসী হয় জানি নে।

প্রতিমার কাছে বিদ্রূপ পেয়েও আজ মনটা সরস মাধুর্য্যে ভরে' গেল। প্রতিমা যখন উপহাস করে তখনই সব চেয়ে বেশী কাছে টানে। তখনই সে অপূর্ব্ব শ্রীতে মণ্ডিত হ'য়ে ওঠে। ওকে দেখে মনে হয়, যে-নারী পরিহাস কর্‌তে জানে না পুরুষকে সে একটা বড় রকম আনন্দ-রস থেকে বঞ্চিত করে। সংযত 'ককেট্রি' (coquetry) নারীর একটি বিশেষ গুণ। এই জিনিষটি প্রতিমার মধ্যে ছিল প্রচুর। এর জন্যে সময় সময় তা'কে শিশুর মতো সরল মনে হোত।

রাত্রে ফিরে প্রতিমার সেবা ও যত্নে লক্ষ্মীছেলের মতো আহারাদি করা গেল। ইচ্ছা করেই চেয়ে চেয়ে বেশী খেলাম। মেয়েরা পেটুক লোকদের খাওয়াতে ভালবাসে। এই খাওয়ানোটা তাদের নিজস্ব জিনিষ। এর মধ্যে তা'দের সমস্ত নারীত্ব মাতৃত্ব ফুটে উঠ্‌তে দেখি। মেয়েরা আসলে মা-ই। স্বামীকে ভাইকে খাইয়েও তা'রা সন্তানকে স্তন্য দেওয়ার স্বাদ মেটায়। এইখানে তা'রা জীবধাত্রী। অতিথিকে দেখে প্রথমেই যে মেয়ের তা'কে খাওয়াবার কথা মনে হয় না নারীত্বের দিক দিয়ে সে পঙ্গু বল্‌তে হবে।

সন্ধ্যার বিদ্রূপ রাতের সেবা যত্নের মধ্যে কখন যে মিলিয়ে গেল জানিনে। পান চিবোতে চিবোতে বল্‌লাম—বৌদি, আর পার্‌ছিনে। বিছানাটা দেখিয়ে দাও শুয়ে পড়ি।

প্রতিমা সুর টেনে বল্‌লো—বারে ছেলে, খেয়েই অমনি ঘুম? বাবা, কি স্বার্থপর এই পুরুষগুলো! দাঁড়াও, আমি খেয়ে আসি আগে। শোবার আগে একটু সেতার শোনাবে না? সেই দরবারী কানাড়াটা কেমন?

অধীর হ'য়ে বল্‌লাম—না বৌদি না, আজ থাক। রোজই তো শোন?

প্রতিমা হেসে বল্‌লো—কেন? পাড়ার লোক ছুটে আস্‌বে বুঝি? বাবা, লোকের ভ'য়েই তুমি গেলে। তুমি চোর না ডাকাত? বেশ' সেতার থাক্ তবে। খানিকক্ষণ গল্প না ক'রে ঘুমোতে পার্‌বে না কিন্তু।···

—আচ্ছা সেই ভাল। তুমি খেয়ে এসো, বৌদি।

—যা শীত পড়েছে। তুমি ঘরে গিয়েই ব'সোগে। আজ তুমি তোমার দাদার বিছানাতেই শোবে, ঠাকুর-পো। নইলে আর অন্য বিছানা তো নেই।

হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌লাম। এতোক্ষণ কোনও খেয়াল ছিল না। তাই তো' প্রতিমা শোবে কোথায়? শোবার তো একটিমাত্র ঘর। আর একটা যে ঘর আছে সেটাকে কোন রকমেই শোবার ঘর করা চলে না। সেটাতে ভাঁড়ার থাকে। তবে কি প্রতিমা আজ রাতটা সেই স্যাঁতসাঁতে ভাঁড়ার ঘরেই কাটাবে? ভয়ানক অস্বস্তি বোধ কর্‌তে লাগ্‌লাম। আগে মনে পড়্‌লে কোনমতেই থাক্‌তে রাজি হ'তাম না—ঝিকেই ডেকে দিতাম। এই শীতের দিনে ভিজে ভাঁড়ার ঘরের মেঝেতে কেউ কখনো শুতে পারে? যদি অসুখ ক'রে তখন দোষ হবে—কার? অনিলদারই বা কি আক্কেল! তিনি জেনে শুনে একজন বাইরের লোককে কেন বাড়ীতে ডাক্‌লেন।

মনটা খুঁত্‌খুঁত্ কর্‌তে লাগ্‌লো। আজ রাত্রে ঘুমোব কেমন করে? প্রতিমাকে যদি বলি—'আমিই বরং ভাঁড়ার ঘরে শোব', সে সেটাকে স্নেহের আতিশয্য ব'লে বিদ্রূপ কর্‌তে ছাড়্‌বে না। সে বড় বিশ্রী হবে···

অনিলদার ঘরে গিয়ে দেখি দু'পাশে দু'টি তক্তাপোষ, তা'র ওপর দু'টি বিছানা। ঘরে আস্‌বাব পত্রের বাহুল্য নেই। একধারে একটি আলমারি। তা'র মধ্যে, নানাবিধ সৌখীন জিনিষপত্র। আর একধারে একটি র‍্যাকে কতকগুলি ভাল বই। দেওয়ালে কতকগুলি প্রসিদ্ধ শিল্পীর ছবি,—অবশ্য ছাপা! রবীন্দ্রনাথের নিজ হাতে সই করা একখানি ফটো। 'পিটারসনের গড়া 'এডাম-ইভে'র একখানি ছবি। এমনি ধারা আরো হাল্কা দু'একটা জিনিষ। সব জড়িয়ে ঘরটির মধ্যে রুচির পরিচয় আছে। বেহিসেবী আস্‌বাবের প্রাচুর্য্য এর হাওয়াকে বন্ধ করেনি। একখানি ঘর হলেও বেশ বড়। দেখ্‌লাম প্রতিমা তখনো তা'র বিছানা অন্যত্র নিয়ে যায়নি। এই বেলা বাড়ী ফিরে গেলে হয় না? প্রতিমা একটা রাত আর একলা কাটাতে পার্‌বে না? ওতো সাধারণ মেয়ের মতো দুর্ব্বল নয়।

প্রতিমা খেয়ে এলো। আমার হাতে কতকগুলি এলাচ-লবঙ্গ দিয়ে বল্‌লো—পান আর দিতে পার্‌লাম না

ফুরিয়ে গেছে, ঠাকুরপো। এই যে জেগে আছো দেখছি। আমি ভেবেছিলাম বোধ হয় নাক ডাকাচ্ছ এতোক্ষণে। কথা কইছ না যে, ঘুম পাচ্ছে বুঝি?

কই না।

প্রতিমা ঘড়ির দিকে চেয়ে বল্‌লো—এই তো সবে দশটা। শীতের রাত কিনা তাই খুব বেশী মনে হচ্ছে। এখন বেশ ঘণ্টা দু'য়েক গল্প করা যাবে। ওকি, শীতে হি-হি করে কাঁপ্‌ছো যে! বিছানায় উঠে বেশ করে লেপটা জড়িয়ে বোস না।

প্রতিমা নিজের বিছানায় উঠে লেপটা চা'রদিকে জড়িয়ে মুখটা বার করে হেসে বল্‌লো--এই দেখ আমি তোমার মত বোকা নই। আরাম করতেও জান না?

অতঃপর আমিও প্রতিমার দেখাদেখি ভাল্লুক হ'য়ে বস্‌লাম। তার পরেই দু'জনে খুব খানিকটা হাসি। সে এক অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা। কিন্তু মনের মধ্যে কোথাও একটা কাঁটা! এখনো চলে গেলে হয়। এমন গরম বিছানা ছেড়ে আমার জন্য প্রতিমাকে রাত কাটাতে হবে কিনা সেই ভাড়ার ঘরে!

বল্‌লাম—বৌদি, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। রাতে আর কষ্ট দিতে চাইনে, এইবার বাড়ী যাই।

প্রতিমা বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লো—তা'র মানে? তবে যে বল্‌লে আজ রাতে থাক্‌বে?

—কিন্তু আমার খেয়াল ছিল না যে তোমাদের একটার বেশী ঘর নেই। তুমি রাত কাটাতে ভাড়ার ঘরে—সে আমার সহ্য হবে না।

—ভাঁড়ার ঘরে?···কেন?···বিছানা তো আমার এই ঘরেই? ও তোমার বুঝি বাধো বাধো ঠেক্‌ছে? কেন বলতো? আমি মেয়েমানুষ বলে নাকি? মেয়েদের তুমি এতো ভয় করো কেন? এই না তুমি তাদের সঙ্গে মেশো। তুমি কি তাদের সঙ্গে কখনো বন্ধুভাবে মেশোনি? মেয়েদের সঙ্গে মিশতে গেলে প্রথমেই বুঝি তা'দের sex টা তোমাদের কাছে বড় হ'য়ে ওঠে, ঠাকুরপো?

কৌতুক ও বিদ্রূপের মিশ্রণে প্রতিমার মুখে এক অপূর্ব্ব শ্রী ফুটে উঠলো। আর আমার সর্ব্বাঙ্গ বরফের মতো ঠাণ্ডা। এ রকম পরীক্ষায় আমি কখনো পড়িনি।

প্রতিমা আবার বল্‌লো—একটা কথা জিজ্ঞেস করি, ঠাকুরপো। স্পষ্ট ক'রে বলো। তুমি কি আমাকে ভালবেসেছ? তুমি পুরুষমানুষ হ'য়ে আমাকে এতো সঙ্কোচ করো কেন? আজকাল প্রায়ই দেখি, তুমি আমাকে এড়াতে চাও। কেন?

আমি চম্‌কে উঠলাম, ক্ষীণস্বরে বল্‌লাম· কি সব যা' তা' বল্‌ছ প্রতিমা!

—যাক্, নাম ধরে ডেকে তবু সাহসের পরিচয় দিয়েছো। 'বৌদি' ডাকের আড়ালে অনেক দেওর বৌদিকে ঠকায়। যেমন মেয়েরা 'দাদা' পাতিয়ে তাদের ভালবাসা লুকোয় তেমনি ছেলেরা 'দিদি' পাতিয়ে। কিন্তু সে যাক্, আমার কথার উত্তর দাও, ঠাকুরপো! সত্য করে' বলো তোমার মনের অবস্থাটা কি। যদি ভালবেসেই থাকো সেটা অন্যায় নয় কিন্তু তা'র মধ্যে প্রবঞ্চনা কেন? ফুলকে ভালবাসা যায় আর মানুষকে ভালবাসলেই দোষ হবে? প্রকৃতির হাতে ফুলও গড়া, মানুষও গড়া।···

এ যে আমারই কথা! কিছুদিন আগে আমিও যে এই সবই ভেবেছিলেম। কে যেন প্রতিমার মুখ দিয়ে আমারই মনের কথা বলিয়ে নিচ্ছে। ক্ষীণস্বরে বল্‌লাম—প্রতিমা, তোমার প্রতি আমি কি কোন অন্যায় করেছি? কোন অশ্রদ্ধা···

প্রতিমা বাধা দিয়ে বল্‌লো– ভালবাসা তো অশ্রদ্ধা নয়, তড়িৎ দা। মানুষ ফুলকে যখন ছেঁড়ে তখনই অন্যায় করে। সে কি ফুলের প্রতি ভালবাসা? তেমনি ভোগের মধ্যে লালসার মধ্যে ভালবাসা নেই। ওকি তোমার মুখের চেহারা ওরকম হোল কেন? একটাও উত্তর দিচ্ছ না যে?

—প্রতিমা, তুমি কি আমাকে উদ্দেশ করে এই সব বল্‌ছো? কোন সন্দেহ···

—তড়িৎ দা, আমি জানি তুমি ছোট নও তবে কেন তুমি অনর্থক সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ছো? আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছু বল্‌ছিনে, সাধারণ ভাবেই বল্‌ছি। আমার মনে হয়, প্রেমের চেয়ে সহজ সুন্দর স্পষ্ট জিনিষ আর কিছু হ'তে পারে না। গোপনতা বা ছলনাই তা'কে কুৎসিৎ ক'রে তোলে। কারুকে ভালবাস্‌তে পারা এবং কারুর ভালবাসা পাওয়া একটা মস্ত সৌভাগ্য। কিন্তু তোমাকে এ সব কথা

বলছিনে। আমি একজন সামান্য মেয়ে। আমি জানি আমাকে ভালবেসে তুমি ভুল কর্‌বে না।···

বল্‌লাম—নিজেকে ছোট ভাবার মধ্যে খানিকটা উদারতা আছে স্বীকার করি, প্রতিমা, কিন্তু মানুষ তা'তে অপরের কাছে ছোট হয় না বড়ই হয়। যদি বলি তোমাকে আমি ভালবাসি তাহলে তুমি কি খুব বিস্মিত হবে? ভালবাসাতো ভেবে চিন্তে আসে না।···

প্রতিমা আমার দিকে খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। তারপর বল্‌লো—এইবার তোমার সঙ্গে আলোচনা কর্‌তে ভরসা পাচ্ছি, তড়িৎ দা। এতোক্ষণ নিজেকে এমন আড়ষ্ট ক'রে তুলেছিলে! ভালবাসা যদি স্পষ্ট হয় তা'কে সহ্য করাও সহজ হয়। কি বল্‌ছিলে? বিস্মিত হব কিনা? বিস্মিত হই বা না হই একটু দুঃখিত হ'ব বই কি। দুঃখ এইজন্যে যে ভালবাসা এক্ষেত্রে একতরফা হোল। আমি তো তোমাকে ভালবাসিনি। আমার স্বামী শুধু যে আমার শ্রদ্ধা পেয়েছেন তাই নয়, ভালবাসাও পেয়েছেন। রূপে তো আমি ভুলিনে তাই স্বামীর প্রতি আমার সে ভালবাসা সহজে নষ্ট হবার নয় কিন্তু যদিই বা কোন দিন নষ্ট হয় তাতেই বা কি? স্বামীকে আমি কোনদিন ঠকাব না। তাঁকে স্পষ্টভাবে সব জানিয়ে দেব, তারপর খুব সহজভাবেই সরে আসব কিন্তু সে তো আমি কোনদিন কল্পনাও কর্‌তে পারিনে।

প্রতিমা খানিকক্ষণ চুপ করে' ফের বল্‌লো—তোমাকে তিরস্কার কর্‌বো এতো বড় অমানুষ আমি নই। প্রেমের যোগ্য না হ'তে পারি কিন্তু তা'কে ঘৃণা কর্‌বো কেন? মা-বাবা ভাই-বোন সকলের ভালবাসা সহ্য কর্‌তে পারি, আর তোমার সঙ্গে কোন রক্তের সম্পর্ক নেই বলেই তোমার ভালবাসাকে ছোট ক'রে দেখ্‌ব? আমি তো জানি, তুমি ভালবেসেছ কা'কে—সে তো আমি নই! আমি তার সামান্য ছায়া মাত্র। আমার মতো শত শত নারীর মধ্যে তুমি তোমার সেই মানসীর ছায়া দেখবে। দোষে-গুণে রক্তে-মাংসে গড়া যে মানুষ তা'কে তো তোমরা বেশীদিন সহ্য কর্‌তে পার না। তোমরা পদে পদে মুক্তি খোঁজ'। স্বপ্ন ভাঙলেই তোমরা নিষ্ঠুর হ'য়ে ওঠো। তাই তো মেয়েরা যতোদিন পারে মায়াবিনী সেজে তোমাদের ভুলিয়ে রাখে।···

প্রতিমা যেন আপন মনেই কথা বলে যাচ্ছে। বল্‌লো—কিন্তু এই মায়ার খেলা আর চল্‌বে না, তড়িৎ দা। এবার থেকে আমাদের জীবনযাত্রা হবে স্পষ্ট—কোন ফাঁকির আশ্রয় নেব না। পুরুষকে আমরা মুক্তি দিয়েই বাঁধবো।···

প্রতিমাকে বাধা দিয়ে বল্‌লাম—তোমার সব কথা বুঝতে না পারলেও এটা বুঝেছি যে প্রেমকে তুমি ঘৃণা কর না। কিন্তু তোমার মতো সকলেই যদি তা'কে সত্যের আলোয় দেখতো সংসারে সুখের সীমা থাক্‌তো না। দেখেছি প্রেমকে অধিকাংশ লোকেই পাপ বলে' মনে করে, বিশেষ করে' আমাদের দেশের মেয়েরা। কোন পুরুষকে ভালবাসা তো দূরের কথা তা'র সঙ্গে সহজভাবে কথা বলাও অন্যায় মনে করে।···

—তা'র কারণ আমাদের দেশের মেয়েরা বেশীর ভাগই অশিক্ষিতা। প্রেম জাগে বেশী বয়সে, যখন জ্ঞান বুদ্ধি প্রখর হয়। অল্প বয়সেই ছেলে মেয়েরা কামনাকে প্রেম ব'লে ভুল করে—বেশী বয়সে নয়। তা ছাড়া আমাদের দেশের মেয়েদের যে বয়সে বিয়ে হয় সে বয়সে প্রেম-সম্বন্ধে তা'দের ধারণা খুবই সামান্য। অবশ্য কামকে তারা বোঝে, কেন না মনের চেয়ে তা'দের দেহটা আগেই সচেতন হ'য়ে ওঠে। তাই পাছে প্রলোভনে পড়ে এই ভয়ে তা'রা পুরুষকে এড়িয়ে চলে, এ দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয়···। কিন্তু প্রেম যখন জাগে তখন মানুষের মধ্যে দুর্ব্বলতাও আসে না, প্রলোভনও আসে না।

বল্‌লাম—প্রতিমা, ভালবাসা বল্‌তে তুমি যা বোঝ তারই আর একটা নাম যদি দি—বন্ধুত্ব?

—হ্যাঁ, তাইতো! বন্ধুত্ব নিবিড় হ'লেই ভালবাসা হোল। কিন্তু মজা এই যে পুরুষে পুরুষে, মেয়েতে মেয়েতে ভাব হ'লে তা'কে বলি 'বন্ধুত্ব' আর পুরুষে মেয়েতে ভাব হ'লে বলি 'ভালবাসা।' আসলে দুটোই এক। ভালবাসাকে বন্ধুত্ব মনে করলে যে কোন মেয়ে যে কোন পুরুষকেই ভালবাসতে পারে। তা'তে সে অসতী হয় না। সতীত্ব কথাটা উঠেছে সৃষ্টির ক্ষেত্রে। সৃষ্টির প্রয়োজনে প্রত্যেক মেয়েকে একটি মাত্র পুরুষকেই বেছে নিতে হয় কারণ সংযমের মধ্যেই সৃষ্টির সূচনা। তড়িৎ দা, আমাকে তুমি তোমার

একজন প্রিয় বান্ধবী বলে ভাবতে পার না? জীবসৃষ্টি ছাড়া আর সব বিষয়েই তুমি আমার সাহচর্য্য পেতে পার!

প্রতিমার শেষ কথাগুলির মধ্যে এমন একটি সারল্য ফুটে উঠলো যে তা'র মুখের দিকে চেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম।

সে আবার বল্‌লো তোমাকে আর বকাব না, তড়িৎ দা, রাত অনেক হয়েছে। কিন্তু তোমাদের কাছে আমার এই অনুরোধ যে নারীকে তোমরা আর দেবী বলে পুতুল ক'রে রেখো না। তাদের দোষে গুণে ভরা মানুষ মনে ক'রে বন্ধু ব'লে কাছে আনো। খানিকক্ষণ আগে তুমি আমাকে অন্য ঘরে তাড়াতে চেয়েছিলে। সে তো দূরের কথা, আমার যদি দ্বিতীয় বিছানা না থাক্‌তো তোমার বিছানাতেই আজ আমি শুয়ে পড়তাম। তোমার পাড়ার লোকদের ভয় কর্‌তাম না।...অবাক হচ্ছ? ভাব্‌ছো পাগল হ'য়ে গেছি?

বল্‌লাম—আমার আর অবাক হবার কিছু নেই প্রতিমা। তুমি সব পার। শুধু ভাবছি, তুমি এতোখানি জোর পেলে কেমন করে!

প্রতিমা গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লো—আমার কাছে এইটেই স্বাভাবিক তড়িৎ দা। আমি ভেবেই পাইনে নারী-পুরুষ পরস্পরকে কেন এতো ভয় করে, ভুল বোঝে, অশ্রদ্ধা করে! সংসারে মানুষ কানের চেয়ে প্রেমকে বড় ক'রে দেখ্‌তে কবে শিখবে? এতো বিধি নিষেধই বা কেন? মানুষ তো নিজেই নৈতিক জীব, সেতো পশু নয়! যাক্‌গে রাত হয়েছে তড়িৎ দা এইবার ঘুমিয়ে পড়। বলবার কথা এতো আছে যে কোনদিন ফুরোবে না। আলোটা নিবিয়ে দি?

শ্রদ্ধার দ্বারা সরলতার দ্বারা মানুষ মানুষকে এতোখানি বদ্‌লে দিতে পারে কে তা জান্‌তো? নিজেকে আমার শিশুর মতো নিষ্পাপ মনে হোল। প্রতিমা নারী বলে' যে একটা স্বতন্ত্র জীব সে কথা ভুলেই গেছি।

হেসে বল্‌লাম—বাঃরে মেয়ে, ঝাড়া দু'ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়ে তা'র পর পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমোতে বল্‌লেই বুঝি পারা যায়! আমার মাথা ধরে' গেছে। অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড় চড় করে। কোন মেয়েই আজ পর্য্যন্ত এমন ক'রে আমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলেনি। তোমার কথাগুলি আমার চিরকাল মনে থাক্‌বে, প্রতিমা।

—আমার আর কি কথা তড়িৎ দা। ভেবে দেখ ওতো তোমারও কথা। তোমার জীবনযাত্রার পথে এমনি ক'রে সব মেয়েকেই ভালবেসো, শ্রদ্ধা ক'রো। তোমার কাছে আমার সেইটেই হ'বে সবচেয়ে বড় পাওয়া। মাথা ধরেছে? কপালে একটু হাত বুলিয়ে দেব? দেখো কত শীঘ্র ঘুমিয়ে পড়বে!

উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে প্রতিমা আমার মাথার কাছে ব'সে আঙ্গুল দিয়ে চুলগুলি নাড়্‌তে লাগ্‌লো কপালে হাত বুলোতে লাগ্‌লো। ও যেন মা—ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে!.....

সে এক অপূর্ব্ব মুহূর্ত্ত.....এক অপূর্ব্ব স্পর্শ! প্রতিমার আঙ্গুলগুলির মধ্যে এক অপূর্ব্ব ভাষা! আমার সকল চেতনা স্থির হ'য়ে এলো। সর্ব্বাঙ্গ শীতল, স্নিগ্ধ! সমস্ত, সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি নির্ব্বাক নিস্পন্দ! সংসারের সকল মলিনতা, কুশ্রীতা, কামনা-বাসনা সব কিছু রাত্রির সেই নিস্পন্দ অন্ধকারে একটি মহিমাময়ী নারীর পবিত্র প্রীতি ও সেবায় ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হ'য়ে গেল। আমি শিশুর মতো পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়্‌লাম।.....

প্রতিমা কখন উঠে গিয়েছিল জানিনে। সকালে ঘুম ভাঙলো অনিলদার ডাকে। তখন চারিদিকে বেশ রোদ উঠেছে। প্রতিমাও বোধ করি একটু আগে উঠেছে কারণ সেও তখন তার বিছানায় ব'সে। চোখে তখনো তার ঘুম জড়িয়ে। আমার দিকে চেয়ে সে একটু হাস্‌লো।

অনিলদা হেসে চেঁচিয়ে বল্‌লেন—বাবারে বাবা, কি ঘুম তোমাদের। বাড়ীতে ডাকাত পড়্‌লেও উঠ্‌বে না দেখ্‌ছি। এতো ধাক্কা দিচ্ছি তবু উঠ্‌বার নামই নেই। প্রতিমারও তাই দশা। কি হ'য়েছিল মশাইদের? কাল ক'টা রাত্রে শুয়েছিলে?

প্রতিমা হেসে বল্‌লো—প্রায় তিনটে!

—ওঃ বাবা, সারারাত্রি জেগেছিলে বলো তাহ'লে? কেন কি এতো কথা হচ্ছিল শুনি? দু'জনে একসঙ্গে হ'লে যে কথার শেষ হয় না তোমাদের ব্যাপার কি?

অনিলদার চোখে মুখে অর্থপূর্ণ হাসি। বল্‌লাম—আমার দোষ নেই অনিলদা। প্রতিমাই আমাকে সারারাত জাগিয়ে রেখেছিল। বাবারে, সে কি বক্তৃতা!

প্রতিমা বল্‌লো—বক্তৃতা দেবনা? বল্‌বো ওকে তোমার সব কীর্ত্তি? জানগো, তোমার বীরপুরুষ ভাইটি পাড়ার ভয়ে কাল রাতে আমাকে ভাঁড়ার ঘরে হিমে জাড়ে নির্ব্বাসন দিতে চেয়েছিলেন!

—তাই নাকি? তা লক্ষণ দেওর কিনা! এক্ষেত্রে কিন্তু আর্য্যপুত্র রামের কোন আজ্ঞা ছিল না, তড়িৎ। এমন কি সীতার অগ্নিপরীক্ষা পর্য্যন্ত অনাবশ্যক হ'বে। তা' পাড়ার লোকদেরই বা দোষ কি? ঘরে যখন ঢুক্‌লাম তখন আমারই যা' হিংসে হচ্ছিল!

অনিলদা যে এতোখানি রসিক আগে জানতাম না! কিন্তু আমি ভারি অপ্রস্তুত বোধ কর্‌ছিলাম। প্রতিমা অবশ্য খুবই হাস্‌ছিলো। বল্‌লো—কেন?

—তোমরা দুটি তরুণ-তরুণী পরম নিশ্চিন্তে গভীর ঘুমে মগ্ন। ভোরের আলোয় যখন সেই দৃশ্য দেখ্‌লাম তখন তোমাদের এতো সুন্দর দেখাচ্ছিল যে কি বল্‌বো। মনে হোল আমার সঙ্গে তোমার বৃথাই বিয়ে হয়েছে, প্রতিমা। তরুণীকে মানায় তরুণেরই পাশে। মনে হোল তড়িৎ যদি তোমার স্বামী হোত তোমাদের জীবন কি সুন্দর কি পবিত্রই না হয়ে উঠ্‌তো। ও কবিতা পড়্‌তো তুমি শুন্‌তে, তুমি গান গাইতে ও বাজাতো। দু'জনে যখন এক সঙ্গে গাইতে রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে যেত। আর যখন ঝগড়া কর্‌তে তখনো পাশের বাড়ীর মেয়েগুলি তোমাকে হিংসে কর্‌তো। তোমাদের খুনশুটির মধ্যেও মধু থাক্‌তো প্রচুর আর যখন দুঃখ আস্‌তো তখনো তা' দু'জনে বেশ সহজে ভাগ করে নিতে.....।

—আচ্ছা গো আচ্ছা! তুমি শুদ্ধু সকাল বেলা বক্তৃতা দিতে সুরু কর্‌লে। জানগো, তড়িৎদা আজ থেকে আমার একজন বিশেষ পুরুষবন্ধু!

—এই নিয়ে তোমার কটি বিশেষ পুরুষ বন্ধু হোল, প্রতিমা?

—এগারোটি।

—আর তড়িৎ তোমার বিশেষ মেয়ে বন্ধু কটি?

হেসে বল্‌লাম—সামনে রয়েছেন একটি। আর আড়ালে রয়েছেন অসংখ্য! পৃথিবীতে যতো ভালো মেয়ে আছেন সকলেই আমার সখী।

অনিলদা বল্‌লেন—তাহলে তুমি কোন মেয়েকে স্ত্রীরূপে পেতে চাও না?

বল্‌লাম—আমার চাওয়ার চেয়ে প্রকৃতির চাওয়াই বেশী। সংসারে জীবের প্রয়োজন হ'লেই সে একটি মেয়েকে আমার স্ত্রীরূপে পাঠাবে কিন্তু একটিমাত্রই। স্ত্রী একটি হ'লেই চলে কিন্তু সখীর শেষ নাই। অবশ্য এসব মতের গুরু হচ্ছেন আপনার উনিই।

প্রতিমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে হাসলাম। প্রতিমা স্বামীর হাত ধরে' বল্‌লো—আর সর্ব্ববিষয়ে আমার গুরু হচ্ছেন ইনি। এই মানুষটির হাতে না পড়্‌লে সব মেয়ের যা' দশা আমারও তাই হোত।

বল্‌লাম—অনিলদা আমাকেও আপনার শিষ্য করে নিন।

—না ভাই, ঐটি পার্‌বোনা। শিষ্যদের কিছু মাত্র বিশ্বাস নাই। সেই পৌরাণিক যুগ থেকে দেখছি তা'রা শুধু গুরুমারা বিদ্যেই শেখেন না, গুরুপত্নীটিকেও মারেন... অনিলদা হো হো' ক'রে হেসে উঠ্‌লেন।

প্রতিমা বল্‌লো—যাও, তোমার খালি ঠাট্টা! হ্যাগো, এতো বাজে বক্‌ছো কিন্তু তোমার বন্ধুটি কেমন আছেন তা'তো বল্‌লে না?

—বল্‌বো আর কি? তাঁকে শ্মশানে পৌছে দিয়েই আস্‌ছি। কালই তাঁর শেষ রাত গেছে কিনা!..... অনিলদার মুখে ক্ষীণ হাসি।

প্রতিমা চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—মারা গেছেন?

—সংসারের লোক তাই বলে বটে।.....

বল্‌লাম অনিলদা, আপনি হাস্‌ছেন—মৃত্যুতেও?

—হাঁ ভাই, কাঁদ্‌তে আমি পারিনে। যদি কাঁদি সে দুঃখে নয়, অত্যন্ত আনন্দে।

ভাব্‌ছিলাম সুখ দুঃখ, জীবন মরণ, নিন্দা প্রশংসা, ঘৃণা প্রেম সব কিছুতেই অবিচলিত এই যে মানুষটি ইনি কোন শ্রেণীর? মনে হোল একে খুব চিনি অথচ চিন্‌তে পারিনে।.....প্রতিমা এবং তা'র স্বামী পাশাপাশি এক বিছানায় ব'সে। একজনের হাতে আর একজনের হাত। মনে হোল এরা হাতে হাতে কথা কইছেন। এই দম্পতির দিকে চেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। মনে হোল প্রণাম করি।

কেন জানিনে আমার চোখে ফুফোটা অশ্রু।.....

মুসাফির

শ্রীসুকুমার সরকার

কামনার কাপালিক ঘুরি আমি যৌবন-চঞ্চল
নিখিল নারীর দ্বারে নিত্য চলি প্রেম-মুসাফির!
কত যুগ কত বর্ষ কত মাস কত পলে পল
জীবন-আঙিনা দিয়ে চলে' যায় চঞ্চল অস্থির!
লক্ষ শ্রাবণের রাত্রি কেঁদে কেঁদে মাথা কুটে মরে
আমার দৃষ্টির আগে; কত মধু-যামিনীর স্নেহ
অতনু-আশীষ সম তনু-তীর্থে ঝরে' ঝরে' পড়ে,
মেলেনা রূপের নারী, মুসাফির নাহি লভে গেহ!
জীবনের কোজাগরী তবু জ্বালে উৎসব-দীপালি!
সে তীব্র আলোর রাগে আলোকিত হ'বে কা'র মুখ
অন্তরের রস-ফল্গু আঁখির মন্তরে দিয়ে ঢালি
কে বিচিত্রা কাছে এসে ভরিয়া তুলিবে ক্ষুব্ধ বুক!
পারাতে সৃষ্টির সীমা পথ হ'তে পথে তাই চলি!
উচ্ছৃঙ্খল অনুভূতি করিয়াছে আমারে উন্মাদ;
অর্থহীন আনন্দেতে নিজ মনে লক্ষ কথা বলি
আছে কি পথের প্রান্তে বসে' কেহ মেলি' রূপফাঁদ!
ফেনিল কামনা মোর ফেনায়েছে সমুদ্রের মত
কাহার আঁখির দিকে সেই স্রোতে চলিয়াছি আমি!
ভিক্ষুক আঁখিতে মোর কে মিলাবে দৃষ্টি অসংযত
বর্ণের লোহিত সুরা তনু-পাত্রে ভরি' দিবাযামি!
কার রূপ-স্বপ্ন-বিষে গিয়াছি গো নীলকণ্ঠ হ'য়ে
যত পান তৃষ্ণা তত উচ্ছলিয়া ওঠে ছুনিবার!

আবেগ-উষ্ণ এ ওষ্ঠ শিহরে প্রলাপ-বাণী ক'য়ে
অসহ অনন্ত এই বিশ্বগ্রাসী যৌবনের ভার!
শোনিত-শ্রাবণে যেন শিহরিছে আদিম পিপাসা
ওষ্ঠপ্রান্তে কেন বহ্নি নাহি জানে আপন নির্ব্বাণ!
বৈশাখের সূর্য্য মোর অঙ্গে করে আলিঙ্গন-আশা
চক্ষে মোর ইন্দ্রধনু জাগায়েছে বিচিত্রের প্রাণ!
শুনি কথা বাতাসের শালবনে বনদেবী সাথে
হাসি দিয়ে গাঁথি মালা; কণ্ঠ মোর হ'য়ে উঠে বাঁশী!
চরণ কাঁপিয়া উঠে জলভরা তৃণের আঘাতে।
প্রেম-ঘন আন্দোলনে সারা বক্ষ উঠেছে উচ্ছ্বাসি!
নীশিথ-বিহগ গাহে অর্দ্ধস্ফুট রহস্যের গান
আশীর্ব্বাদ-কলকণ্ঠ ভেসে আসে জল-দেবতার!
এ তনু-তন্ত্রীতে মোর ব্যগ্র তৃষা হোলো কম্পমান
মুগ্ধ প্রাণ রুদ্ধবাক্ দৃষ্টিহীন নয়ন আমার!
অসহ এ পুলকের উগ্র সুরা না পারি সহিতে
তবুও কহিব কথা মেলিব এ দৃষ্টি দূর পানে
বেপমান দেহভার আর আমি না পারি বহিতে
তবু চলি লোকে লোকে অদৃশ্যার বাহুর আহ্বানে!
আকাশের উর্ব্বশীরা তারা-চক্ষে চাহিছে মধুর
ধরা সে অধর মেলে মোর পদ-স্পর্শের প্রলেপে!
বায়ু সে বহন করে গীত-ধ্বনি অন্তর-বধূর
চলি পথ বলি কথা ধ্বনি তার ওঠে বিশ্ব ব্যেপে!

অবলা আশ্রম

শ্রীঅবনীনাথ রায়

অবলা আশ্রমের তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বেরুল। দেখে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই যে এ রিপোর্ট আমাদের দেশের শতকরা নিরনব্বইটি রিপোর্ট যেমন হ'য়ে থাকে ঠিক তেম্‌নি। অর্থাৎ এতে বিশেষত্ব কিছু নেই—আছে কতকগুলি মামুলী ধরণের বিবরণ যা' কোন শক্ত চিন্তাকেই উদ্রিক্ত করে না। অবলা আশ্রমের সর্ব্ববিধ দুঃখের মূল অনুসন্ধানের চেষ্টা এ রিপোর্টের মধ্যে নেই—সুতরাং সরলা দেবী চৌধুরাণীর পৃথক মন্তব্য পড়ে' কেউ বিস্মিত হবেন না আশা করা যায়।

মূল অনুসন্ধানের চেষ্টা যদি থাক্‌ত তবে প্রথমেই দেখ্‌তে পেতুম এই প্রস্তাব যে মেয়েদের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার মেয়েদের উপরেই দেওয়া হোক্। ওর ভেতর পুরুষদের হস্তক্ষেপ করবার অধিকার থাক্‌লে পদে পদে জঞ্জাল বেড়ে চলে ছাড়া কমে না। কোন বিষয়কে বিচার করবার দৃষ্টি পুরুষদের এবং মেয়েদের এক নয়। সুতরাং মেয়েদের সম্পর্কে পুরুষদের বিচার কোনদিনই চূড়ান্ত বলে' গৃহীত হ'বে না।

রিপোর্টে বলা হয়েছে অবলা আশ্রমের অধিকাংশ মেয়েদের বিয়ে হয় সিন্ধীদের সঙ্গে। বাংলা দেশের মেয়েরা যতই adaptability-প্রবণ হোক্ তাদের পরিপূর্ণ understanding যে বাঙ্গালীদেরই সঙ্গে এ কথা সত্য। সুতরাং বাঙ্গালী পাত্র পাওয়া গেলে সিন্ধুদেশে তা'রা নিশ্চয়ই বিয়ে করতে চাইত না। বাঙ্গালী পাত্র কেন পাওয়া যায় না এ কথা বোঝা শক্ত নয়। আমরা বিবাহ বিষয়ে অত্যন্ত গোঁড়া। পরিচিতের মধ্যে বিয়ে দিতে হলে'ও কুল শীল গোত্রের গোলমালে অনেক যায়গায় বিয়ে ভেস্তে যায়। সুতরাং যে মেয়ের বাপ মাকে চিনি নে, যাদের বাপ মায়ের কোন পরিচয়ই নেই, বরঞ্চ দুনাম আছে, তাদের মেয়েকে কে ইচ্ছে করে' নেবে? কিন্তু এই প্রশ্ন মনে জাগে যে সিন্ধীরা সাধারণতঃ অবলা আশ্রমেই বিয়ে করতে আসে কেন? সিন্ধুদেশে মেয়ের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম এই কি তার একমাত্র কারণ? এ কথাও শুন্‌তে পাওয়া যায় যে এই সিন্ধীদের স্বদেশে একটি করে' স্ত্রী আছে, উপরন্তু বাংলাদেশে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ ক'রে সুখী হয়। এ কথার সত্যাসত্য আমি জানি নে। রিপোর্টেও এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু বিয়ে করতে হলেই অবলা আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষদের যে রকম পণ দেওয়ার প্রথা আছে রিপোর্টে দেখা গেল তা'তে মনে এই ধারণা হওয়া বিচিত্র নয় যে জামাতা হওয়ার উপযুক্ততা ওখানে টাকা দেওয়ার শক্তির উপর কতকটা নির্ভর করে। অর্থাৎ টাকা দিতে পারলে জামাতৃত্ব থেকে সহজে কেউ খারিজ হয় না। তবে মিঃ প্রভুদয়াল হিম্মতসিংকা সিন্ধুদেশ দেখে এসে মেয়েদের সুখের যে রকম বর্ণনা দিয়েচেন তাতে এ সন্দেহের কতকটা নিরসন হয় বটে। তবু রিপোর্টে এ বিষয়ের আলোচনা থাক্‌লে ভাল হ'ত।

কিন্তু যে কারণে অবলা আশ্রমে ১৫ জুলাইয়ের ধরণের ব্যাপার অনুষ্ঠিত হ'তে পারে তার মূল খুঁজতে হ'লে আমাদের আরো অনেকদূর এগিয়ে যেতে হবে। একটা কোন single instance থেকে তার মূলীভূত কারণ আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস অবলা আশ্রম প্রতিষ্ঠানটি বর্ত্তমানে আমাদের সামাজিক জীবনের পক্ষে একটি সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ওখানে এত পরিমাণ অর্থ জমা নেই যার আয় থেকে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মেয়েদের অনাদি কাল ধরে' ভরণপোষণ করা যেতে পারে। অথচ মেয়েদের ভর্ত্তি হওয়ারও কামাই নেই। কেউ ভর্ত্তির জন্য উপস্থিত হ'লে তা'কে ফিরিয়ে দেওয়া কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই গৌরবের কথা নয়। সুতরাং ভর্ত্তির পদ্ধতি অব্যাহত রাখ্‌তে হ'লে পূর্ব্ববর্ত্তিনীদের dispose of করতেই হবে। এই dispose of করার সুরুচি সঙ্গত উপায় হচ্ছে বিবাহ। এই বিবাহ নিজের নিজের জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ হ'লেই হয়ত সুখের হ'ত কিন্তু সে বিষয়ে বাধা যে কত গুরুতর তা পূর্ব্বেই বলেচি। সুতরাং অবলা আশ্রমের অবলাদের দুঃখ ঘোচাতে হ'লে হয় আমাদের বিবাহ বিষয়ে অত্যন্ত উদার হ'তে

হবে, না হয় ত যথেষ্ট চাঁদা দিয়ে অবলা আশ্রমের কোষাগার পুষ্ট করতে হবে। এ দুটি উপায়ই যে কি রকম দুঃসাধ্য তা বোধ হয় বোঝা শক্ত নয়। বিবাহ আমরা একটি অত্যন্ত সুনির্দ্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে করতেই অভ্যস্ত। ঘর, অঘর, কুলীন, শ্রোত্রীয়, রাঢ়ী, বারেন্দ্র, ফুলে, খড়দা, সুরাই, সর্ব্বানন্দী, মেল ইত্যাদি কতই না তার বাদ্‌বিচার। তার উপর দু'পক্ষের ধর্ম্ম আছে, জাতি আছে। এত বাধা ঠেলে' স্বাভাবিক অবস্থায়ই দু'পক্ষের বিবাহ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, তার উপর আবার অবলা আশ্রমের কুলকলঙ্কিনী? রিপোর্টে জানা গেল মেয়েদের কয়েকজনের বিবাহ বাঙ্গালীর ঘরেই হয়েচে। যাঁরা এ বিবাহ করতে এগিয়েচেন তাঁদের আমি সাধুবাদ দিই। তাঁরা হয়ত সমাজের কাছ থেকে সাধুবাদ পান নি। সেখানে পিতা মাতার বাধ্য সন্তান হ'য়ে গতানুগতিক পন্থায় যাঁরা বিবাহ করেন প্রশংসা তাঁদেরই একচেটে।

পয়সা তোলা আজ কালকার দিনে যে কত দুর্ঘট তা ভুক্তভোগীরা জানেন। সম্প্রতি মানুষের অবস্থার কোন নিশ্চয়তা নেই। সরকারী চাকরির stability নিয়ে প্রশ্ন উঠেচে, বেতন হ্রাস হওয়ার হুকুম ত বেরিয়েই গেল। ব্যবসার বাজার মন্দা। তার উপর দেশে বন্যা, দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে। ম্যালেরিয়ার কৃপায় আর ডাক্তারের অনুগ্রহে প্রত্যেকের বাড়িতে দুর্ভিক্ষ লাগ্‌তেও দেরি নেই। সুতরাং এরকম অবস্থায় অবলা আশ্রমের জন্যে নূতন চাঁদা উঠ্‌বে এ আশা বোধ হয় দুরাশা মাত্র।

অতএব অবলা আশ্রম আগেও যে রকম চলেচে এখনো ঠিক সেই রকমই চল্‌বে অর্থাৎ সেখানে দরকার মত আমাদের মেয়েদের পাঠাতেও কুণ্ঠিত হ'ব না, সময় বিশেষে তা'রা প্রস্তুতও হবে, তাই নিয়ে নিজেরা এবং খবরের কাগজওয়ালারা হা হুতাশও করব, তদন্ত কমিটির রিপোর্টকে নিরর্থকও বল্‌ব, অথচ তার মূল কারণ নির্ণয় করে' কোনদিনই তার সংশোধনের সহায়তা করব না। সস্তা ভাববিলাস এবং ছে'দো কথাবার্ত্তা আমাদের বিশেষত্ব হয়ে দাঁড়িয়েচে।

কিন্তু অবলা আশ্রমের মত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা নিতান্ত নির্ব্বোধও অস্বীকার করতে পারবে না। আমাদের সমাজের কুমারী এবং বিধবা মেয়েদের পদস্খলন হ'লে আমরা তাদের অবলা আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা লজ্জার দায় থেকে মুক্তি পাই। অবলা আশ্রমের মত প্রতিষ্ঠান না থাক্‌লে এই সব মেয়েদের এক মা গঙ্গার কোল ছাড়া আর কোথায় যে সুষ্ঠু আশ্রয় মিল্‌ত আমি ত ভেবে পাই নে। সুতরাং অবলা আশ্রম সম্বন্ধে আমাদের সমাজের কি কোন কর্ত্তব্য নেই?

একে ত এই সব অপরাধের দায়িত্ব আমরা কেবলমাত্র মেয়েদের মাথার উপর চাপিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত হই—তা' তা'রা সে বোঝা মাথায় নিয়ে রসাতলে তলিয়েই যাক্ আর যাই হোক্। সত্যিই এবিষয়ে পুরুষদের স্বার্থপরতার সীমা নেই। তার উপর আবার যদি তাদের বিবাহের পথও সুগম করে' না দিই, তাদের ভরণপোষণের কোন বন্দোবস্ত না করি, তবে আমাদের সমাজকে নির্ব্বীর্য্যের, কাপুরুষের, আর জড়ের সমাজ ছাড়া কি বল্‌ব? যে সমাজ শুধু শাস্তি দিতেই তৎপর, কিন্তু মানুষের অন্তরে যে নারায়ণ বাস করেন তাঁর প্রেরণার কোন ধারই ধারে না, তার আয়ুষ্কাল যে খুব দীর্ঘ নয় একথা কল্পনা করা বোধ হয় অবিচার নয়। নিজের দুষ্কৃতির গুরুভারেই সে একদিন ধসে' পড়্‌বে।

আমার প্রণয়-কাহিনী

ইসাডোরা ডানকান

অনুবাদক—উপগুপ্ত

পিম

আমার কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কিছুদিন কেটে গেছে। একদিন সকালে ব্যাঙ্কে গিয়ে শুনলাম যে সব টাকা ফুরিয়ে গেছে। দিন কয়েক পরে সেণ্টপিটার্স বার্গ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে ফ্লোরেন্স ত্যাগ করলাম। এ যাত্রা আমার সুখের নয়; মেয়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এই প্রথম। আমার স্বাস্থ্যের অবস্থাও খুব ভালো নয়। মেয়েকে এই সবে মাই-ছাড়ানো অভ্যাস করাচ্ছি, সে জন্য যত্নের সাহায্যে স্তন-দুগ্ধ বার ক'রে দেওয়া হ'ত। এত খারাপ লাগতো যে কী বলবো। চোখে জল আসতো।

রুশীয় দর্শকবৃন্দ সানন্দে আমার অভ্যর্থনা করলে। তখনকার কথা আমার খুব বেশী মনে নেই। শুধু এইটুকু স্মরণ আছে নৃত্যের সময় আমার উচ্ছ্বসিত স্তন-দুগ্ধ আমার 'টিউনিক' ভিজিয়ে আমাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলতো। মেয়েদের পক্ষে এসব কাজ কী কঠিন।

বলা বাহুল্য যে, সব সময় আমার অন্তর ফ্লোরেন্সের দিকে উন্মুখ হ'য়ে ছিল। তাই যতদূর সম্ভব এবারের অভিযান সংক্ষেপে সেরে হল্যাণ্ডে গেলাম, কারণ তা হ'লে আমার প্রিয়জনদের অনেকটা কাছাকাছি থাকতে পারে।

আমষ্টারডাম-এ প্রথম রাত্রে এক অদ্ভুত পীড়ায় আক্রান্ত হ'লাম। বোধ হয় স্তন-দুগ্ধের জন্য এই অসুখ। নৃত্যাভিনয়ের শেষে মঞ্চের উপরেই মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লাম। সেই অবস্থায় আমাকে হোটেলে নিয়ে আসা হ'ল। কত দিন, কত রাত্রি অন্ধকার ঘরে শুয়ে রইলাম, কিছুই খেতে পারতাম না। শুধু আফিম মিশ্রিত দুধ খেতাম, আর প্রলাপের পর প্রলাপ ব'কে বেহুঁশ হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়তাম।

ফ্লোরেন্স থেকে এল ক্রেগ—ও যেন সাক্ষাৎ অনুরাগ। তিন চার সপ্তাহ ও আমার কাছে থেকে আমার শুশ্রূষায় সাহায্য করতে লাগলো। তারপর একদিন এলেনরা ডুজের টেলিগ্রাম পেয়ে ও নাইস-এ চ'লে গেল। এলেনরা যে-নাটকের অভিনয় করবে ও সেই নাটকের দৃশ্যপট আঁকবে। কিছুদিন পরে সংবাদ পেলাম দুশপট নিয়ে দু'জনের ভীষণ কলহ হ'য়েছে; তাই আমাকেও নাইসে আসতে হ'ল!

যখন নাইস-এ পৌছিলাম, তখনো আমি বড় দুর্ব্বল। নিকটেই আর একটা হোটেলে এলেনরা ডুজ পীড়িত; তিনি প্রত্যহ আমার সংবাদ নিতেন। আমার অসুস্থ অবস্থা অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। একটু সুস্থ হ'য়ে হ'ল্যাণ্ডে আমার স্বগিত নৃত্যের পুনরাভিনয়ের জন্য বেরিয়ে পড়লাম।

ক্রেগের প্রতি আমার অসীম অনুরাগ—প্রাণের সবটুকু দিয়ে ওকে ভালোবাসি—কিন্তু বুঝলাম আমাদের বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। তবু আমার চিত্তের বিকার-অবস্থা এতদূর গড়িয়েছিল যে, ও-র সঙ্গ আমি সহ্য ক'রতে পারতাম না, ও-কে ছেড়ে থাকাও ছিল আমার পক্ষে অসম্ভব! ও-র সঙ্গে চিরকাল থাকা মানে আমার আর্ট, আমার ব্যক্তিত্ব জলাঞ্জলি দেওয়া, শুধু তাই নয়, আমার জীবন, আমার জাগ্রত চেতনা বিসর্জ্জন দেওয়া! ও-কে ছেড়ে থাকা মানে নিরন্তর অবসন্নতার মাঝে ডুবে থাকা, ঈর্ষার আগুনে দগ্ধ হওয়া। সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ক্রেগ্ অপর রমণীদের আলিঙ্গনবদ্ধ হ'য়ে রয়েছে—এই ছবিটা ভূতের ভয়ের মতো রাত্রে আমার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে থাকতো, কিছুতেই ঘুমোতে পারতাম না। কল্পনায় দেখতাম ক্রেগ অন্য মেয়েদের কাছে আর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করছে, আর তা'রা মুগ্ধদৃষ্টিতে ও-র পানে চেয়ে আছে; দেখতাম, ক্রেগ অপর মেয়েদের পেয়ে খুশী হয়েছে—তাদের পানে তাকিয়ে আছে, ঠোঁটে তা'র সম্মোহন হাসি—এলেন টেরী-র সেই হাসি—ও মুগ্ধ হয়েছে—ও তাদের আদর

করছে—ও মনে মনে বলছে,—"এই মেয়েটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে। যাই বল না কেন, ইসাডোরা এ-র কাছে কিছুই নয়।"

এই সব চিন্তায় আমার মন কখনো প্রচণ্ড ক্রোধে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতো, কখনো বা হতাশায় মুখ ড়ে পড়তো। কোনো কাজ ক'রতে পারতাম না, নৃত্যেও আর পা উঠতো না। আমার নৃত্য সাধারণের মনোরঞ্জন করবে কি-না, সে-বিষয়ে আমি গ্রাহ্য করতাম না।

বুঝলাম, মনের এ অবস্থার নিবৃত্তি হওয়া প্রয়োজন। হয় ক্রেগ না হয় আমার আর্ট ধ্বংস হোক্—কিন্তু নৃত্য ত্যাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব; তা হ'লে মর্ম্মান্তিক দুঃখে দিনে দিনে শুকিয়ে আমার মৃত্যু হবে। এর প্রতীকার চাই; হোমিওপাথদের ঔষধ প্রণালীর কথা আমার মনে পড়লো। মনপ্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করলে সব জিনিষই পাওয়া যায়—তেমনি এর প্রতীকারও আমি খুঁজে পেলাম।

একদিন অপরাহ্নে সে আমার ঘরে প্রবেশ করলো; দেখতে সুন্দর, সভ্য, তরুণ,—রঙ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ; নিখুঁত পোষাক। সে বল্লে,—বন্ধুরা আমাকে পিম্ ব'লে ডাকে।

আমি বললাম,—পিম! চমৎকার নাম তো। তুমি কি আর্টিষ্ট?

—না!

যেন কেউ ওকে খুন করার জন্য দোষ দিচ্ছে এমনিভাবে ও অস্বীকার করলে।

—তা হ'লে তোমার কী আছে? খুব বড় 'আইডিয়া'?

—না গো, না। আমার কোনো আইডিয়াই নেই।

—কিন্তু জীবনের কোনো উদ্দেশ্য?

—তাও নেই।

—তা হ'লে কর কি তুমি?

—কিছু না।

—কিন্তু কোনো কাজ তোমার করা উচিত।

এবারও ও ভেবে-চিন্তে উত্তর দিলে,—দেখ, আমি অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেকগুলি সুন্দর নক্সদানী সংগ্রহ করেছি।

এই তো আমার প্রতীকার! পূর্ব্বে রাশ্যায় যারার সব বন্দোবস্ত করেছিলাম; এবার শুধু উত্তর রাশ্যায় নয়, দক্ষিণ রাশ্যা, এমন কি ককেসাস্ পর্য্যন্ত ভ্রমণ ক'রে আসবার ইচ্ছা ছিল; কেবল এতদূর একা যেতে ভয় হচ্ছিল।

বললাম,—পিম, তুমি আমার সঙ্গে রাশ্যায় যাবে?

এবার তৎক্ষণাৎ ও উত্তর দিলে,—ও, খুব আনন্দের সঙ্গে যাব। শুধু মা আছেন, তা আমি তাঁর মত করিয়ে নেব। কিন্তু আরো একজন (পিম এককেবারে লজ্জায় রক্তিম হ'য়ে উঠলো)—আরো একজন—সে আমায় বড় ভালোবাসে—সে হয়তো যেতে মত দেবে না।

—কিন্তু আমরা তো গোপনে পালাতে পারি।

তাই স্থির হ'ল। আম্ষ্টারডাম-এ শেষ অভিনয় রাত্রে রঙ্গালয়ের দ্বারে একখানা গাড়ী দাঁড়াবে, তাতে চেপে আমরা পালাবো। পরিচারিকা সব জিনিষপত্র নিয়ে ট্রেনে আসবে, আমরা পরের স্টেশনে উঠবো।

কুয়াশাচ্ছন্ন ঠাণ্ডা রাত, মাঠের ওপর ঘন কুয়াশা। শোফারের ইচ্ছে নয় জোরে গাড়ী চালায়, কারণ রাস্তাটি একটি খালের ধার দিয়ে গেছে। সে আমাদের সাবধান ক'রে দিলে,—রাস্তাটি ভারী বিপদজনক।

কিন্তু পিছন থেকে অনুনত হওয়ার কাছে এ বিপদ কিছুই নয়। পিম সহসা পিছনে তাকিয়ে ব'লে উঠ্‌ল—হা ভগবান! সে আমাদের পিছু নিয়েছে।

আমি কোনো উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলাম না।

পিম বললে,—হয়তো ও-র কাছে পিস্তল আছে।

আমি শোফারকে আরও জোরে চালাতে বললাম, কিন্তু সে অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখালে যে, কুয়াশার ভিতর থেকে খালের জল চক্‌চক্ করছে। ভারি অদ্ভুত লাগছিল, অবশেষে অনুসরণকারীদের এড়িয়ে আমরা সবেমাত্র পৌছিলাম। সে রাত্রে কাছের একটা হোটেলে আশ্রয় নিলাম।

রাত তখন দুটো। হোটেলের ভৃত্যটি আমাদের মুখের ওপর লণ্ঠন উঁচু ক'রে ধরলো।

সে থাক। আমাদের প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও সেই ভৃত্যটি আমাদের দু'খানি শয়ন ঘরের ব্যবস্থা করলে, একটা সুদীর্ঘ করিডোরের দু'প্রান্তে দুটি ঘর; আর সেই করিডোরে সারাটা রাত্রি সে রইল ব'সে হাঁটুর ওপরে লণ্ঠনটা রেখে; যখনই পিম বা আমি দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা গলাই তখনই ও লণ্ঠনটা উঁচু ক'রে যা বলে তা শুনেই আমাদের মাথা ভিতরে ঢুকিয়ে নিতে হয়। এমনি করলো সারারাত।

এমনিধারা লুকোচুরি খেলে সকালে আমরা পিটার্সবার্গ-এ রওনা হলাম। জীবনে কখনও এমন আনন্দ পাই নি।

পিটার্সবার্গে পৌছে আমি হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলাম, ট্রেণ থেকে নামলো আঠারোটি ট্রাঙ্ক,—সব কটিতেই পিমের আত্মাক্ষরটি লেখা।

বললাম,—এ কী?

পিম বললে,—এ ক'টা মাত্র আমার লগেজ। এটাতে আছে গলাবন্ধ; এ দুটোতে লিনেন কাপড়ের অন্তর্বাস, এ দুটোতে আমার স্যুট; আর ঐ দুটোতে আমার জুতো। আর এইটাতে আছে পশমের তৈরী বাড়তি ওয়েষ্ট কোট—রাশ্যায় এগুলো ঠিক খাপ খাবে।

হোটেল জুল্যাঁরোপের সিঁড়িটি বেশ চওড়া, আর সিঁড়ি দিয়ে প্রতি ঘণ্টায় নামবে পিম, গায়ে নানারকমের পোষাক, নানা রঙের গলাবন্ধ—দর্শকরা প্রশংসার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে। কারণ পিম সব সময় অতি সুন্দর সুন্দর পোষাক প'রে থাকে, আর ও হচ্ছে ফ্যাসানের মানদণ্ড। ডাচ্ চিত্রকর ভ্যান ডে ওর পোর্ট্রেট আঁকছে, তার ব্যাক গ্রাউণ্ডটা 'টিউলিপ ফুলে' ভর্ত্তি।—সোণালি টিউলিপ—বেগুণি টিউলিপ—গোলাপী টিউলিপ; সর্ব্বোপরি ও-র চেহারাখানা দেখতে হয়েছে যেন বসন্ত ঋতুর মনোহর টীউলিপ-পুষ্প-বীথি—ওর সোণালি ফুল সোণালি টিউলিপগুচ্ছের মতো, ওর ঠোঁট গোলাপী টিউলিপের মতো, আর ও যখন আমাকে আলিঙ্গন করে তখন মনে হয় যেন হাজার হাজার টিউলিপ ফুলের উপর দিয়ে ভেসে চলেছি।

পিমকে দেখতে বেশ, গৌরবর্ণ, নীল চোখ—কিন্তু ওর মধ্যে কোন প্রতিভা নাই। ওর সঙ্গে প্রণয়ের কথা ভাবলে অস্কার ওয়াইল্ড্ এর কথা মনে পড়ে,—"যে দুঃখ চিরস্থায়ী তার চেয়ে ভালো যে ক্ষণস্থায়ী।" পিম আমাকে সেই আনন্দ দিয়েছে যে আনন্দের আয়ু মুহূর্ত্তকাল। এতদিন পর্য্যন্ত প্রেম আমার জীবনে রোমান্স এনেছে, আদর্শ এনেছে, দুঃখ এনেছে! কিন্তু পিম এনেছে আনন্দ-লঘু আহ্লাদ, শুধু খুশী;—আর ঠিক সেই সময়ে যখন তা' আমার সবচেয়ে প্রয়োজন; ও না থাকলে আমি নিশ্চয় স্নায়বিক পীড়ায় আক্রান্ত হ'তাম। পিমের উপস্থিতি এনে দেয় আমাকে নব জীবন, নতুন সজীবতা। বোধহয় এই প্রথম বুঝলাম, শুদ্ধমাত্র যৌবন পাওয়ার আনন্দ কী। ওর প্রফুল্লতার যেন আর অন্ত নাই। আমি ভুলে গেলাম আমার মর্ম্মান্তিক দুঃখ, বেঁচে রইলাম এই মুহূর্ত্তের মাঝখানে, কোনো কিছুতেই আমার দৃকপাত নাই, আমি সুখী।

এই সময়ে আমি একটি নৃত্যের পরিকল্পনা করি, তার নাম দিয়েছি "সঙ্গীত মুহূর্ত্ত"; রাশ্যানরা তা' এত বেশী পছন্দ করতো যে প্রতি সন্ধ্যায় সে-নৃত্য আমাকে পাঁচ-ছ' বার নাচতে হ'ত। "সঙ্গীত মুহূর্ত্ত" হচ্ছে পিমের নৃত্য—'মুহূর্ত্তের আনন্দ।'

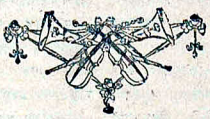

'শেষপ্রশ্নের' শেষ*

শ্রীলীলাময় রায়

প্রতি দিনের ডাকে পত্র ও পত্রিকা আসছে আমাকে ধিক্কার দিয়ে কিম্বা অনুযোগ জানিয়ে। আমার অপরাধ আমি (১) "শেষ প্রশ্নে"র ও "পথের দাবী"র" নিন্দা করেছি এবং (২) শরৎচন্দ্রকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ ও অশ্রদ্ধা করেছি।

দ্বিতীয় অভিযোগের সাফাই গেয়ে ফল নেই। আমার বন্ধুরা জানেন যে আমি শরৎচন্দ্রকে মানুষ হিসাবে ভক্তি ক'রে থাকি। লেখক হিসাবে কাউকে ভক্তি করা না করা অবান্তর। গুণ দেখ্‌লে প্রশংসা করব, দোষ দেখ্‌লে নিন্দা করব লেখকের সঙ্গে পাঠকের এই ত' সম্বন্ধ। লেখা প'ড়ে যদি মনে হয় যে লেখকের আগের ক্ষমতা নেই, এবং আধুনিক চিন্তা জগতের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে তিনি কিছু পেছিয়ে পড়েছেন, সেকথা মুখ ফুটে বলাই উচিত। কারণ পাঠক হিসাবে লেখককে এ কথা জিজ্ঞাসা করবার অধিকার সকলেরই আছে যে, "আপনি তো সেই শরৎচন্দ্র নন্ যিনি 'শ্রীকান্ত, বিরাজ বৌ ও দেনা-পাওনা লিখেছিলেন? আপনার এই নব রূপে আবির্ভাব অভিনন্দন-যোগ্য। কিন্তু এর পিছনে বিশেষ আয়োজনের লক্ষণ তো দেখ্‌ছিনে? যে সব কথা আপনার নায়ক-নায়িকার মুখে শুনছি সে সব মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ইউরোপে শোনা যেতো বটে; কিন্তু আগ্রা সহর কি এতই পশ্চাৎপদ?"

ঠিক এইরূপ প্রশ্ন ক্রেতামাত্রেই বিক্রেতাকে ক'রে থাকেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের মকরধ্বজ, ডান্‌লপ্ কোম্পানীর টেনিস্ বল্, এ সব যখন কিনি তখন যাচাই করেই কিনি, সন্দেহ করেই কিনি।

এবার প্রথম অভিযোগের সাফাই।

শরৎচন্দ্র কেবল বাংলার নন্ তিনি বিশ্বের। তাঁকে আমরা সেই মাপকাঠিতে মাপ্‌ব ও সেই বাটখারাতে তৌল করব যাতে সকল দেশের ও সকল কালের রসজ্ঞ পাঠক স্বদেশের ও স্বকালের লেখকদের মাপ ও তৌল করে থাকেন। লেখকটি শরৎচন্দ্র ও বিষয়টি বিপ্লবাত্মক ব'লে যে সব গ্রন্থ সাহিত্য নয় সে সব গ্রন্থকে সাহিত্য বল্‌ব না। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় চার সম্বন্ধে বই লিখেছিলেন! চাষীরা ওগুলি মাথায় করে' রাখুন। শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী" ও "শেষ প্রশ্ন" প'ড়ে তাঁরাই উপকৃত হবেন যাঁরা দেশের স্বাধীনতার ও সমাজের নব ব্যবস্থার উপায় খুঁজ্‌ছেন। কিন্তু আমরা চিরন্তন পাঠক, সার্ব্বভৌম পাঠক, আমরা কোদালকে কোদাল বল্‌তে বাধ্য। আমরা রবীন্দ্রনাথকেও মাঝে মাঝে দোষ দিয়ে থাকি এই বলে' যে তিনি কবিতা নাম দিয়ে দর্শন লিখ্‌ছেন, প্রবন্ধ নাম দিয়ে sermon লিখ্‌ছেন। আমরা বিদেশী নাট্যকার বার্ণার্ড শ'কে অনুরূপ কারণে দোষী করে' থাকি। সাহিত্যের মধ্যে আপনা আপনি অনেক জিনিষ এসে পড়ে, যেমন কলসীতে গঙ্গাজল ভর্‌বার সময় এক আধটা পুঁটি মাছও ঢোকে। তা ব'লে কলসী তো জাল নয়। সাহিত্য তো সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভ নয়।

দূর হোক, এ নিয়ে তর্ক করে' কা'কে বোঝানো যাবে? যাঁরা সাহিত্য পড়েন, বোঝেন ও লেখেন তাঁরা আমার কাছে সাফাই চাইবেন না। শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্রও আমার সঙ্গে একমত হবেন। দেশে দুর্গতির বান ডেকেছে। মানুষ শরৎচন্দ্র লেখনী দিয়ে তাই ছেঁচে ফেল্‌ছেন। লেখক শরৎচন্দ্র নিশ্চয় জানেন যে লেখনী চালালেই লেখা হয় না।

---

* গত আশ্বিন সংখ্যা 'স্বদেশে' প্রকাশিত লেখকের 'শেষপ্রশ্ন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (স্বঃ সঃ)

'হারিয়ে যাওয়া মনটি আমার'

শ্রীরাজেন্দ্র মিত্র

ছোট্ট সংসার···

দু'টি মাত্র প্রাণী···স্বামী আর স্ত্রী। খুব সুখেই তাদের দিন কাটে।···অসিত যে দিন নব পরিণীতা বধূ জয়াকে নিয়ে এই পাহাড়ের কোলে ছোট বাংলোটিতে এসে "নীড়" বাঁধলে ···সে দিন প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব বেশ একটু আশ্চর্য্য হয়েছিল।

জয়ার নিপুণ হস্তের স্পর্শে বাংলোর চেহারা ঘুরে' যায়, দেয়ালে কলি পড়ে, জানলা দরজা রং করা হয়, পোড়ো বাগানে ফুল ফুটে ওঠে; বাংলোর বুকে সরু পথটিতে আবার নূতন করে' লাল কাঁকর বিছানো হয়। জয়া নিজের হাতে ঘর-দোর বেশ তক্‌তকে করে' সাজিয়ে ফেলে। চারদিকে বাগান হয়, নানা ফুলের গাছ আসে। নানা রকমের পাখী পোষা হ'লো; একটি হরিণ শাবক এনে বাগানে ছেড়ে দেয়, হরিণ শিশু খেলা করে, কখনো আবার কচি কচি ঘাসের ওপর দিয়ে দৌড়ে বেড়ায়, জয়া আর অসিত বারান্দায় ডেক্‌চেয়ারে শুয়ে দেখে। জয়া মিঠে গলায় গান করে—

"সে কোন বনের হরিণ ছিল আমার মনে
কে তারে বাঁধ্‌ল অকারণে—"

মোট কথা পাহাড়ের বুকে যেন একটা ছবি ফুটে উঠ্‌লো। দু'জনে অনেক ভেবে বাড়ীটির নাম দিলে—"আমার নীড়।"

ঘরের আস্‌বাবপত্র নূতন করে' কেনা হয়, টেবিল-হারমোনিয়ম, ছোট একটা এসরাজ, একটা বাঁশের বাঁশী; তাতেও যখন হলো না, তখন একটা রেডিও সেট্‌ও এল। সকাল বিকেল রেডিও হয়—তারপর জয়ার গান অসিতের বাঁশী বাজানো তো আছেই।···তাদের প্রাণ দিয়ে গড়ে' তোলা সংসার আরও সুন্দর হয়ে ওঠে।

অসিত গবর্ণমেণ্টের একজন বড় চাক্‌রে, এখন দু'শো টাকা পায় পরে আরো বাড়বে;—এই তো সেদিন ঢুকেছে।

হাজারিবাগ ষ্টেশনের কাছেই আফিস। ১০টায় যায় আবার ৫টায় বাড়ী আসে। তারমধ্যেও মাঝে টিফিনের নাম করে' প্রায় জয়াকে দেখেও যায়। আফিসের ছুটির পর আর কেউ তাকে আট্‌কে রাখতে পারে না ছুটির ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে কলম রেখে বাড়ীমুখো হয়। আফিসের বন্ধুরা ঠাট্টা করে, দু'একজন আবার হেসে বলে—"নতুন বউ কিনা, এ রকম হয়।"···অসিত দূর হ'তে দেখে জয়া বাগানের ফটকের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে, হরিণ তা'র পায়ের কাছে লুটিয়ে খেলা করে,···অসিত বেশ একটু গর্ব্বিত হ'য়ে ওঠে। তারপর দু'জনে হাত ধরে' সরু পথ দিয়ে 'আমার নীড়' এসে ঢোকে।

কপোত-কপোতীর মতই তাদের নীড় প্রেমে ভরপুর। বাইরের দিকে চাইবার তাদের অবকাশ নেই। এই তো জীবন!···

দুই

শুভ্র শরৎকাল।

সবে ভোর হয়েছে; পাহাড়ী ক্ষেত হ'তে বেশ একটা ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস ভেসে আসে; পূবের আকাশ তখনো রাঙা হয়ে ওঠেনি।

জয়া বারান্দায় একটা ডেকচেয়ারে শুয়ে গান গেয়ে যায়—

"আমার রাত পোহাল শারদ প্রাতে
বাঁশী তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে?"

···সামনে খুব আকাশের দিকে চেয়ে জয়ার গান করতে বেশ ভালই লাগে। তখনো চোখ হতে ঘুমের তন্দ্রা সম্পূর্ণ যায় নি। ভোরের বাতাসে চুলগুলো মুখে এসে পড়ে।

অসিত ঘুম-চোখে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, বলে, "বাঃ বেড়াতে যাবে, আমাকে তো ডাকনি! বেশ একলা উঠে বেড়াতে যাবার চেষ্টায় আছ?"

জয়া একটু হেসে উত্তর দেয়—"এই তো তোমায় আমার গান দিয়ে ডেকে তুললুম্—বেড়াতে যাবো বলেই

তো। এমনি যদি ডাকতুম, কখনই কুঁড়েমি করে' উঠ্‌তে না; আমার গানের সুর তোমায় জাগিয়ে দিলে—নিজেই এসে দাঁড়ালে আমার সামনে।

অসিত বলে—"বেশ তো সুন্দর গান করছিলে—থামলে কেন?"

জয়া অসিতের দু'টো হাত ধরে' দাঁড়িয়ে উঠে বলে—কী সুন্দর শরতের এই ভোরের সময়টি! চল খানিকটা বেড়িয়ে আসি।"

দু'জনে মেঠো রাস্তা দিয়ে বেড়াতে চলে' যায়। পথে নানা বিষয় আলোচনা হয়—সাহিত্য, রাজনীতি কিছুই বাদ যায় না।

সূর্য্য ওঠে, তার সোণার প্রথম রৌদ্র তাদের মুখে চোখে এসে পড়ে; জয়া সূর্য্যের দিকে চেয়ে থাকে, চোখ ঝল্‌সে যায় না, বেশ একটা তৃপ্তি পায়।

আবার দু'জনে "আমার নীড়ে" ফিরে আসে।

জয়া চায়ের জল চড়িয়ে দেয়, চাকর এসে জলখাবার টেবিলের ওপর সাজিয়ে দিয়ে যায়—চা খাওয়া চলে।

তারপর জয়া টেবিল-হারমোনিয়মের কাছে বসে' গান করে, অসিত বাঁশী বাজায়।

আফিস যাবার পূর্ব্বে দু'জনে এক সাথে খেতে বসে। অসিতের সাথে খেতে জয়ার প্রথম প্রথম লজ্জা করতো, কিন্তু এখন তা সয়ে গেছে।

...অসিতের তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ হয়, ঘর হতে ফিরে এসে বলে—"আমি তাহলে চল্লুম।

জয়া খেতে খেতে উঠে দাঁড়ায়, বাঁ হাতে অসিতের পাঞ্জাবীর একটা কোণ ধরে' বলে—"দুপুরে একবার আসবে তো? আর আফিসের ছুটি হলেই চলে' এসো কিন্তু।"

অসিত জয়ার চিবুক ধরে' ঘাড় নেড়ে উত্তর দেয়—"আসবো।"

অসিত চলে' যায়, পথ হতে বার বার করে' পিছন ফিরে দেখে জয়া দাঁড়িয়ে আছে! ক্রমে অসিত রাস্তার মোড় ঘুরে যায়, তাকে আর দেখতে পাওয়া যায় না—জয়া আবার খেতে বসে।

তাদের দৈনন্দিন জীবন এমনি ছিল!

তিন

সে দিন শনিবার।

ছুটির ঘণ্টা পড়বার পরই অসিতের সহকর্ম্মী অনিল এসে বলে—"আমার বাড়ীতে একটা Tea Party-র ব্যবস্থা করেছি তোমাকে এখন যেতে হবে।"

অসিত একটু ইতস্ততঃ করে' উত্তর দেয়—"বাড়ীতে একটু কাজ ছিল, বাড়ী হতে একবার ঘুড়ে সন্ধ্যের দিকে যাবার চেষ্টা করবো।"

অনিল হেসে বলে—"তোমায় বাড়ী ছেড়ে দিলে আর ফিরে পাওয়া যাবে না, এখনই চলো।"

অসিত চুপ করে' থাকে, জয়ার সুন্দর মুখটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

পাশ হতে আর একটি বন্ধু বলে' ওঠে—"শ্রীমতীর মুখ নয় একটা দিন দেরীতেই দেখলে! ধন্যি তোমাদের টান বাবা! আমরা তো বাড়ীর চেয়ে আফিসেই ভাল থাকি। বাড়ীতে বউ-এর প্যান-প্যানানি, ছেলেমেয়েগুলোর নানা সুরে চীৎকার—এক একদিন তিতিবিরক্তি ধরে' যায়।"

কথা শেষ হয় না; ধীরেন আবার যোগ দেয়—"শুধু কি তাই!...সমস্ত দিনের হাড় ভাঙা খাটুনির পর কোথায় বাড়ী যেয়ে বিশ্রাম করবো! যাবার মাত্রই শোনো বড় মেয়েটার জ্বর হয়েছে, কোলের ছেলেটার Horlick-ও আর নেই!"

আফিসের বৃদ্ধ কর্ম্মী দাদামশায় এবার আর থাকতে না পেরে বলে' যায়—"ভায়ারা, আফিসে ভাল থাকি তাতে সন্দেহ নেই। তবে কিনা সারাদিনের পরিশ্রমের পর দেবীর পাশে এসে না বসলে মনটা যেন কেমন কেমন করে; গিন্নীর আঁচলের হাওয়ায় সব ক্লান্তি ভুলে যাই; লোভ বেড়ে যায়,—আদর করে' ডাকি—"আমার মুক্ষমণী", তিনি অমনি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন—"যাও, বুড়ো বয়সে রস উথ্‌লে উঠ্‌ছে, ছেলে মেয়েরা আবার কেউ দেখতে পাবে"—একটু অভিমান করে' মুখটা সরিয়ে ফেলি—।"

সকলে খুব হেসে ওঠে।

দাদামশায় অসিতের পিঠ চাপ্‌ড়ে বলে—"চলো, শ্রীমুখ-পঙ্কজ ভাবলে কি আর পথ চলতে পারবে? আজকের অদর্শনে তোমাদের ভালবাসা আরও জমে' উঠবে, রাত্রে

যেয়ে দেখবে নাত্‌বৌয়ের মুখ অভিমানে লাল হয়ে গেছে, আরও সুন্দর দেখাবে।"

অসিত হেসে বাধ্য হয়ে বলে—"তবে চলো।"

বাড়ীফিরে আসতে রাত হয়ে যায়। অসিত সমস্ত পথটা কেবল ভাবে—জয়া হয়তো এখনও তা'রি অপেক্ষায় বসে আছে! অন্ধকার মাঠের ওপর দিয়ে বেশ জোরেই পথ চলে; ঐ যে বাড়ী, চারিদিক অন্ধকার; চাকরটা হয়তো এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে।

বাড়ীর ফটকের কাছে যেতেই জয়া এগিয়ে আসে, কিন্তু কোন কথাই বলে না।

অসিত বোঝে যে জয়া রাগ করেছে। সে তার দেরী হবার কৈফিয়ৎটা বলবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

জয়ার দিক হতে কোনই প্রশ্ন হয় না, তখন নিজেই বলতে সুরু করে—"বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে' মিছামিছি দেরী হয়ে গেল, কিছুতেই তারা ছাড়বে না! অগত্যা যেতেই হলো; খাওয়া শেষ হতেই রাত হয়ে গেল, তবু—আমি থিয়েটার না দেখেই চলে এলুম।"

জয়া অভিমান করে' বলে—"না এলেই তো পারতে!

অসিত তা'কে আদর করে' জড়িয়ে ধরে—"সত্যি বলছি আজ আমার একটুও যাবার ইচ্ছে ছিল না!"

জয়ার অভিমান তখনো যায়নি, অসিতের একটা হাত ধরে' বলে' যায়—"আজ কত রান্না করলুম—শনিবার কোথায় একটু বেড়াবো—"

...অসিত জয়ার কপালের ওপর হতে চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বলে—" সত্যি আমার অন্যায় হয়েছে—এই অন্ধকার রাতে তোমাকে বসিয়ে রাখাটা উচিত হয়নি।"

তারপর যথারীতি মানভঞ্জন চলে—অসিতকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়—আর কখনো এ রকম হবে না।

চার

"আমার নীড়ের" কিছু দূরের পোড়ো বাংলোতে ভাড়াটে এল। অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী অপরেশবাবু আর তাঁর পৌত্রী নীলিমা।

সেদিন অসিত আফিস হতে আসবার পর জয়া বলে—" ওগো, এতদিন পরে আমাদের একজন প্রতিবেশী জুটলো; ঐ সামনের বাংলোতে ভাড়াটে এসেছে।"

অসিত উত্তর দেয়—" হাঁ, নীলিমা আর তার দাদামশায় এসেছেন; সকালে আফিস যাবার সময় নীলিমার সাথে আমার দেখা হয়েছে,.. এখানে দিন কতক থাকবে।"

জয়া বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে—"তুমি ওঁদের চেনো নাকি?" অসিত কোটের বোতাম খুলতে খুলতে বলে—"চিনি বৈকি! নীলিমা আমার সঙ্গে কলেজে পড়তো যে! আচ্ছা, তোমার সাথে আলাপ করে দেবো।"

জয়া শুনে চুপ করে' থাকে, কিছু বলে না।

সন্ধ্যায় চা ও জল খাবার পর অসিত জয়াকে বলে—"আমি একবার অপরেশবাবুর সাথে দেখা করে' আসি, আর অমনি নীলিমাকেও ডেকে নিয়ে আসবো।"

জয়া এগিয়ে আসে, অসিতের একটা হাত ধরে' বলে' যায়—"তোমায় ডাকতে হবে না! এখন তুমি যেতে পাবে না! আজ রেডিওতে রবিবাবুর 'শারদোৎসব' হবে, শুনবে না বুঝি?"

অসিত উত্তর দেয়—"আমি এখনি চলে আসবো। তাছাড়া অপরেশবাবুর সাথে একবার দেখা না করলে তিনিই বা কি মনে করবেন! আর নীলিমাও।"

জয়া হাত ছেড়ে দেয়।

...Calcutta Time, ঠিক ৮-১০ মিনিট। প্রথমে রেডিও অর্চ্চেষ্ট্রা আরম্ভ হয়;—

"শরতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে
আনন্দ-গান গারে হৃদয় আনন্দ-গান গারে।"

জয়া বারান্দার আলো নিবিয়ে দিয়ে একটা ডেক-চেয়ারে শুয়ে শোনে।...অসিতের অনুপস্থিতির জন্য তা'র খুব বেশী ভাল লাগে না!...এক একবার মাঠের জমাট অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে দেখে অসিত আসে কিনা,... রেডিও অর্চ্চেষ্ট্রা থেমে যায়। শরতের আহ্বান-গীত সুরু হয়।—জয়া আত্মহারা হয়ে গান শুনে যায়, মাঝে মাঝে গুণ গুণ করে' সুর মিলিয়ে গানটা আবৃত্তি করে;

অসিত পথ হতেই ডাকে—"জয়া আলোটা জ্বাল'... নীলিমা এসেছে।" জয়া কিছুই শুনতে পায় না, অসিত কাছে এসে ডাকে, জয়া উঠে দাঁড়িয়ে চাকরকে আলো আনতে বলে।

রেডিওতে তখন গান চলছে।—

নীলিমা অন্ধকারে দাঁড়িয়েই বলে—"বেতারশিল্পীরা রবিবাবুর নাটকে বিশেষ সুবিধে করতে পারে না—।"

অসিত উত্তর দেয়—"কিন্তু অন্য লেখকদের বই তো মন্দ অভিনয় করেনা!—সৌরীনবাবুর নাটকগুলোয় খুব successful হয়েছে।"

নিলীমা একটু ভেবে বলে—"বিশেষ করে' রবিবাবুর গানগুলো নিয়েই তো যত গোলমাল করে—।"

চাকর আলো দিয়ে যায়, দু'জনে বারান্দায় উঠে' চেয়ারে বসে' পড়ে।

তারপর জয়ার সাথে নীলিমার পরিচয় হয়, নানা কথাবার্ত্তা চলে। কিন্তু জয়াকে দেখে নীলিমা বোধ হয় অন্তরে খুব বেশী তৃপ্ত হ'তে পারে না। ভাবে হিন্দুর ঘরের মেয়ে একটু লেখাপড়া শিখলেও যেন কিরকম জড়সড় ভাব।

জয়ারও নীলিমাকে খুব বেশী ভাল লাগে না বিশেষ করে' নীলিমার সাজের ভঙ্গী, কথা বলবার ধরণ, লম্বা লম্বা কথায় সে বেশ বিরক্ত হয়ে ওঠে।

কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে যায়, নিলীমা নিজের রিষ্টওয়াচের দিকে চেয়ে বলে—"এবার চলো অসিত আমায় পৌছে দিয়ে আসবে, রাত বারোটা বাজে।" তারপর জয়াকে ছোট্ট একটা নমস্কার করে—"আজ ভাই, তা'হলে চলি, কাল আবার আসবো।"

জয়া মনে ভাবে—এটিকেট্ দুরস্ত খুব।'

অসিত নীলিমার সঙ্গে চলে' যায়। পথ চলতে চলতে নীলিমা জিজ্ঞেস করে—"তাহলে জয়াকে পেয়ে খুব সুখী হয়েছো?—সুখের 'নীড়' বেঁধেছো দেখলুম!

অসিত হাসে' কিছু উত্তর দেয় না।

অল্পক্ষণ পরে অসিত ফিরে এসে জয়াকে বলে—"কেমন মনে হলো নীলিমাকে? এককালে আমাদের দু'জনে খুব ভাব ছিল। যাক্, এবার হতে তোমার দুপুরটা আর একলা কাটাতে হবে না।"

জয়া কোন উত্তর না দিয়ে মশারি ফেলে' শুয়ে পড়ে।

—পাঁচ—

তারপর দিন হ'তে নীলিমা দিনের মধ্যে ২।৩ বার করে' আসে। দুপুরে জয়ার সাথে গল্পগুজব্ও চলে।

নীলিমা বি-এ পাশ করে' ইংরেজীতে এম্-এ পড়ছে; দাদামশায়ের শরীরটা ভাল নেই বলে' কিছুদিনের জন্য এখানে বেড়াতে এসেছে। জয়া স্বামীর কাছে শুনেছে নীলিমা ব্রাহ্ম বলেই অসিতের সাথে বিয়েটা হয়নি।

তবে নীলিমা আসবার পর হ'তে জয়ার সুখের জীবনে একটু যেন ভাটা পড়লো।

অসিত আর সন্ধ্যায় জয়াকে নিয়ে বেড়াতে যায় না, আফিস হতে এসেই অপরেশবাবুর বাড়ী চলে যায়। আবার যেদিন বেড়াতে যায় নীলিমাও এসে জোটে, সকালে চা খাওয়াটাও প্রায়দিন নীলিমাদের বাড়ীতেই হয়। পূর্ব্বের মত অসিত দুপুরে আর জয়াকে দেখতে আসে না; বোধ হয় লজ্জা করে···পাছে নীলিমার কাছে ধরা পড়ে' যায়। এইরকমে তাদের আগেকার নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে।

একদিন তো রাত বারটার সময় অসিত বাড়ী ফিরলো। নীলিমাদের বাড়ীতেই খেয়ে এসেছে। জয়া ছিনায় শুয়ে রইলো; সেদিন রাতে তা'র খাওয়া হলো না। তারপর কথার পর কথা, চোখের জলে নিবৃত্তি।

অসিত এতে নিজের দোষের কিছুই পায় না। এইভাবে ক্রমশঃ তাদের সুখের দাম্পত্য জীবনে অশান্তির সৃষ্টি হয়। ক্রমে দু'জনে প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া আর বলে না··বুকের মধ্যে দু'জনেরই ব্যথা পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে।

নীলিমা বাইরে থেকে কিছুই বুঝতে পারে না; নীলিমার সামনে বেশ হাসি গল্প হয়।

"আমার-নীড়ে" অশান্তির সূত্র হলো। কারো কোন বিষয় যত্ন নেই, রেডিও বন্ধই থাকে হারমোনিয়মের ওপর একরাশ ধুলো জমে; যত্নের অভাবে সখের পাখীগুলো মরতে আরম্ভ করে। দু'জনে পরস্পরের ওপর অভিমান করে' বসে' থাকে, দু'জনেরই বুকে দীর্ঘশ্বাসের ঝড় বয়ে যায়।

এরকম ভাবে আরও কতদিন কাটতো কে জানে!··· কিন্তু এবার নীলিমাদের কলকাতায় ফিরে যাবার সময় এল।

ছয়

নীলিমারা চলে' যাবার পরদিন—

সমস্তদিন অসিত আফিসে বসে' জয়ার কথা মনে মনে আলোচনা করে;—ভাবে তা'র নিজেরই তো দোষ;

অবিবাহিতা যুবতীর সাথে অতটা ঘনিষ্টতা দেখলে,···স্ত্রীর চোখে তা একটু কষ্টকর হয় বৈকি! পূর্ব্বের মত' জয়ার কথা শোনে না, দুপুরে দেখতেও যায় না, সকালে নিজে খেয়ে আফিস চলে' আসে। যাক্, আজ যেয়ে দোষ স্বীকার করতে হ'বে।

বাড়ীতে এসে দেখে জয়া দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জয়ার সামনে এসে অসিত থমকে দাঁড়ায়, মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরোয় না, চোখোচোখী হতেই জয়া চোখ নামিয়ে নেয়। জয়া আর দাঁড়াতে পারে না, ঘরে যাবার জন্য পা বাড়ায়, অসিত এবার এগিয়ে আসে, জয়ার একটা হাত ধরে' বুকের কাছে টেনে এনে ডাকে—"জয়া, জয়া, জয়া! আমি—"

জয়ার চোখের জল বাধা মানে না, অসিতের গালের ওপর এসে জমা হয়।

অসিত জয়াকে নিজের বাহুবেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ করে' বলে—"আমিই দোষী, আমায় ক্ষমা কর, কি কষ্টে যে এতদিন কেটেছে আমার!···"

জয়া মিষ্টি হাসি হেসে বলে' যায়—"তাহলে আমি বুঝি এত'দিন খুব সুখে ছিলাম? ওঃ আজ আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে! আজ তোমাকে নূতন করে' পাবার সুখে প্রাণ আমার ভরপুর! কী সুখী আজ আমি!"

জয়া অসিতের কাঁধ ধরে' গেয়ে যায়—

—"জীবন জুড়ে লাগুক পরশ
ভুবন ব্যেপে জাগুক হরষ
তোমার রূপে মরুক ডুবে
আমার দু'টি আঁখি-তারা।"

অসিত বলে—"আজ কতদিন পরে তোমার গান শুনছি; চলো হারমোনিয়ম বাজিয়ে ভাল করে' গান করবে।"

জয়া অসিতের চিবুক ধরে' হাসতে হাসতে বলে—"এই তো বেশ গান করছি! ভাল লাগছে না বুঝি?"

—আবার গেয়ে চলে—"

হারিয়ে যাওয়া মনটি আমার
ফিরিয়ে তুমি আনলে আবার—।"

নারী

শ্রীবিমল ভট্টাচার্য্য

আজ যা'র তুমি কণ্ঠ জড়ায়ে কাল তা'রে ভুলে যাও
দেখনি যাহারে নয়নের কোণে চুম্বন তা'রে দাও।

নয়নে মাখিয়া হাসি
একদিন যা'র পানে চেয়েছিলে এখন দেখনা আসি;

অনাদর ভরে' দূরে সরে' যাও না চেয়ে তাহার মুখ
নীরব নিশীথে একদিন যা'র দিয়েছিলে বুকে বুক;

তুমি যে নিঠুরা নারি!
জীবনের হাঠে তোমার রূপের বিকিকিনি কর ভারি।

কোন্ দাম দিয়ে কা'রে তুলে লও তোমার স্বর্ণ-খাটে;
দেখনা তো কত রাজার দুলাল ভিখারী তোমার হাটে;

তোমার জীবন-মাঝ
কতবার কত পালা শেষ হয় আসিতে নামিতে সাঁঝ।

নিষ্ফল প্রয়াস

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

যেদিন সে এসেছিলো, আমি ছিনু খুব সাবধানে ;
বেশি কথা কহি নাই, শুনি নাই। পাছে, সেই স্বর—
যখন সে চলে' যাবে—সে আলাপ নিদুর-মধুর,
পৃথিবীর সব শব্দ মোর মনে ফিরাইয়া আনে,
দূর-গ্রহ-সঞ্চরণে সারারাত্রি বাজে মোর কানে,
সকল কাজের রোলে লাগে সেই আলাপের সুর।
—তাই বই নিয়ে চুপচাপ—অথবা ঘুমের ভাণে
কাটায়ে দিলাম আমি একটি বিরল দ্বিপ্রহর।

ভালো ক'রে তাকাই নি তা'র মুখে ; পাছে সেই চোখ,
চোখের সে-মুগ্ধ দৃষ্টি, স্বপ্নে-ভরা শান্ত দৃষ্টি দেখে—
যখন সে চলে' যাবে—আর-কিছু ভালো নাহি লাগে ;
নীলাকাশে ফোটে পাছে সে-দৃষ্টির মদির আলোক,
নদীস্রোত বয়ে' আনে আঁকা-বাঁকা উজ্জ্বল অলক,
নিদ্রার আঁধার ভরে' সেই মুখ, সেই চোখ জাগে,
বর্ষার আঁধারে দেখি রাশি-রাশি চুলের স্তবক।
—তাই তো ঘুমের ভাণে দৃষ্টি মোর রাখিলাম ঢেকে।

আমার হাতের পাশে এলায়িত তাহার শরীর,
নারীর শরীর তা'র প্রেম-মোহে আশ্চর্য্য সুন্দর ;
তবু ধরি নাই হাত, একবার করি নি চুম্বন
উন্মুখ অধরে তা'র ;—পাছে মোরে উন্মাদ, অস্থির
করে' দেয় সেই স্পর্শ, সেই স্বাদ—অতীত-স্মৃতির
মৃত্যুহীন প্রেত-দল হানা দেয় আমার জীবন
যখন সে চলে' যাবে।—আমি তাই আলস্যে স্থবির
ভয়ে-ভয়ে যাপিলাম দুর্লভ, নীরব অবসর।

যেদিন সে এসেছিলো' আমি ছিনু খুব সাবধানে ;
বলেছিনু মনে-মনে ; 'যা হয়েছে, তা-ই শেষ হোক্,
আর নয় ; বহু ঝড়ে, আলোড়নে আহত হৃদয়,
এবার কঠিন হও ; খরস্রোত ফেনিল যেখানে,
অনেক ডুবেছো সেথা ; এইবার শান্তির সন্ধানে
দূরে যাও, ঘুরে' যাও। তা-ই ভালো—কোরো না সংশয়।'
—এ-ই শান্তি ?···হে ঈশ্বর, সহে না, সহে না আর প্রাণে ;
যেদিকে তাকাই আমি, সেই মুখ, সেই কালো চোখ !

যখন সে চলে' গেলো, ভাবিলাম, 'যাক, এ-ই শেষ ;
এবার শান্তির সাথে মুখোমুখি হোক্ পরিচয় !'
বিদায় দিলাম তা'রে হাসিমুখে ঘরের দুয়ারে।
তারপর···রাত্রির তিমিরে ব্যাপ্ত তা'র উষ্ণ কেশ,
স্বপ্নের গোধূলি-রাজ্যে অশ্রুদীপ্ত আঁখির উন্মেষ,
পৃথিবীর সব দৃশ্যে—আলোকে, আঁধারে দেখি তা'রে
সব শব্দে শুনি তা'র স্বর। পৃথিবী প্রেতের দেশ—
মৃতের স্মৃতির স্তূপে প্রেত হ'য়ে ঘুরিছে হৃদয়।

'আধুনিকী'

শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী

কোন লেখকের গ্রন্থ সমালোচনা ক'তে হ'লে সেই লেখকের চাইতে সমালোচকের পাণ্ডিত্য গভীরতর হওয়া বাঞ্ছনীয় ;—নতুবা অবিচারের সম্ভাবনা খুব বেশী। বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও বিচারকের আসন গ্রহণ করা ধৃষ্টতা। নলিনীবাবুর পাণ্ডিত্যের বিস্তার ও গভীরতা এত বেশী যে বাংলাদেশে তাঁর বইয়ের প্রকৃত সমালোচনা করতে পারে এমন লোক অতি বিরল। নলিনীবাবুর রচনা পড়ে' মনে হয় সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, ফরাসী ও ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ—তাছাড়া আধুনিকতম বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, প্রভৃতিতেও তাঁর যথেষ্ট অধিকার আছে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালের আধুনিকতম খবর তাঁর নখদর্পণে। চেতনার এবং অবচেতনার রাজ্যে তাঁর অবাধ গতিবিধি। দেবতা, মানুষ, যক্ষ, রক্ষ, প্রেত প্রমথ—সবারই সঙ্গে যেন তাঁর নিবিড় পরিচয়। এ হেন সর্ব্ব-বিদ্যাবিশারদের গ্রন্থ সমালোচনা করতে হ'লে আরেকজন সর্ব্ববিদ্যাবিশারদের প্রয়োজন। নিজের অসামর্থ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হয়েও যে নলিনীবাবুর বই সম্বন্ধে কিছু লিখতে উদ্যত হয়েছি—সে কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধিদ্বারা প্রনোদিত হয়ে। নলিনীবাবুর লেখার সমস্ত অর্থ হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারি না—কারণ তার উপযুক্ত পাণ্ডিত্যের অভাব, তবু এটা বুঝি যে এই জাতীয় রচনার বহুল প্রচার ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার হওয়া প্রয়োজন।

এ লেখা পড়ে' আমাদের যে মনোভাব তা কবির ভাষায় বলা যায়

"বজ্র-মন্ত্রে কি ঘোষিলে বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম,
জয় তব জয় !"

এক ঝলক আলো এসে আমাদের সুপ্ত চৈতন্যে চাঞ্চল্য জাগায় ; আমরা বুঝতে পারি না এ আলো আলেয়ার, না প্রদীপের, না জ্যোতিষ্কের। আমাদের ক্ষমতা হয় না কোথা থেকে এ দীপ্তি আসছে স্পষ্টভাবে চোখ মেলে তার উৎসের সন্ধান নেবার কিন্তু তার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারি। এ আলোর ইসারায় জেগে উঠতে হ'বে, খুঁজে দেখতে হ'বে, বুঝে দেখতে হ'বে কতখানি অজ্ঞাত পথ আমরা অতিক্রম করতে পারি এ অভিনব দীপ্তির সাহায্যে। এ আলো রসাতলের পথে নিয়ে যাবে কি স্বর্গের পথে নিয়ে যাবে সে কথা বলতে পারি না ;—তবে আমাদের গতির সাহায্য করবে -জানিনা সে গতি উর্দ্ধগতি হবে কিম্বা অধোগতি হবে। চিন্তাবৃত্তির বিশ্রাম মৃত্যুতুল্য। অনুসন্ধিৎসা যদি মৃত্যুর পথে নিয়ে যায়, তবু তা কল্যাণের ; কিন্তু ক্ষতির সম্ভাবনায় নিস্তব্ধ হ'য়ে বসে' থাকা আরও ক্ষতিকর।

সাধারণ মানুষ চলে গড্ডালিকা প্রবাহের মতন, সামনে কোথায় বাধা বিপদ আছে তার কোন খোঁজই সে রাখে না। কিন্তু যাঁরা মনিষী তাঁরাই খোঁজ দিতে পারেন কোন্ দিকে বিপদ আর কোন্ দিকে শ্রেয়র সন্ধান মিলবে। নানা বিরুদ্ধ মতের দন্দ্বের মধ্যে আমরা হতভম্ব হ'য়ে পড়ি, কত আলেয়ার পিছনে ছুটেই না ক্লান্ত হই। যাঁদের দিব্যদৃষ্টি কিম্বা দূরদৃষ্টি আছে—তাঁরাই আমাদের কল্যাণের পথে সুপরিচালিত করতে পারেন। নলিনীবাবুর দিব্যদৃষ্টি আছে কিনা সে খবর দেবার আমার ক্ষমতা নাই কিন্তু তাঁর যে ভূয়োদর্শন আছে এ পরিচয় তাঁর রচনার পত্রে পত্রে।

আমাদের সাহিত্য-সাধনা, ধর্ম্মাচরণ, শৌর্য্য-প্রকাশ, দেশসেবা প্রভৃতির মূল উৎস রয়েছে আমাদের অবচেতনাস্থিত এক যৌন-লালসার মধ্যে ;—ফ্রয়েডের প্রচারিত এই তথ্যকে যতটা উচ্চাসন দেওয়া হয়—নলিনীবাবুর মতে তা অন্যায্য। তাঁর মতে আমাদের সমস্ত কর্ম্মচাঞ্চল্যের মূলে রয়েছে ব্রহ্মোপলব্ধির স্পৃহা। এত বড় দুইটি আপাতবিরুদ্ধ উক্তির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য আছে কিনা, কিম্বা কোনটা গ্রাহ্য কিম্বা দুইটিই অগ্রাহ্য—আমাদের উচিত সেটা আবিষ্কার

করা। বর্ত্তমান যুগে একদিকে প্রবল নাস্তিক্যবাদ আর অন্যদিকে ধর্ম্মান্ধতা কিরূপ সংকীর্ণ এবং ভয়াবহ হ'য়ে উঠেছে —নলিনীবাবু অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে সেটা দেখিয়েছেন। আমাদের প্রয়োজন এই সঙ্কটের মধ্যে থেকে সরে' একটি নিরাপদ আশ্রয় অবলম্বন করা। সে প্রয়োজন যথার্থ কিনা কিম্বা নলিনীবাবু সাবালক শিশুদের জুজুর ভয় দেখিয়েছেন— সে কথা চিন্তাশীলদের বিবেচ্য। নারী ও পুরুষের মধ্যে একটি নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হ'তে চলেছে, গ্রন্থকার এ সম্বন্ধে একটি দুর্ব্বোধ্য এবং বিস্ময়কর ইঙ্গিত করেছেন—শুধু ইঙ্গিত নয়, নানা সাক্ষীসাবুদ দিয়ে সপ্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। নারীর মধ্যে যে পুরুষালী ভাব দিন দিন বেশী হ'য়ে ফুটে উঠ্‌ছে গ্রন্থকারের মতে তার প্রথম কারণ—নারীর কাছে এতদিন পুরুষই ছিল মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ; তাই নারী যখন মেয়েমানুষত্ব ছেড়ে' পূরা মানুষ হবার আকাঙ্খা করলো তখন সে অজ্ঞাতসারেই পুরুষ হ'য়ে উঠল; দ্বিতীয় কারণ—পুরুষ পুরুষের সাহচর্য্যের মধ্যেই এমন একটি অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব রস আবিষ্কার করেছে সে রসের কাছে নারী-সাহচর্য্যের আনন্দ অপেক্ষাকৃত পান্‌সে; তাই নারী সেই নূতন রসের জোগান দেবার জন্য পুরুষ হ'য়ে উঠছে; তৃতীয় কারণ অর্থ-নৈতিক।

এমনি নানা নয়া নয়া সমস্যা ও বিচিত্র তথ্যে গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ। যথেষ্ট মনযোগ এই গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং এর আলোচ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে' নূতন নূতন আলোচনার উদ্ভব হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেই দু' একটি কথা বললাম।

বইটির নাম আধুনিকী—কিন্তু আধুনিক সমস্ত সমস্যা নিয়ে একটি মাত্র গ্রন্থে আলোচনা করা অসম্ভব। গ্রন্থকার শুধু আধুনিক মনের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বিশদ করে' বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। আধুনিক মন যে অত্যন্ত বিশ্লেষণ-প্রিয়, সমগ্রের চেয়ে অংশের প্রতিই তার গভীরতর মনোযোগ, বৃহৎকে উপেক্ষা করে' অনুর দিকেই সে বেশী উদগ্রীব - এই তত্ত্বটি গ্রন্থকার নানাভাবে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। গ্রন্থকার আধুনিক মনের একটি বৈশিষ্ট্যকে মাত্র প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু আধুনিক মন তার এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে জীবনের নানাক্ষেত্রে কি কি অভিনবত্ব দেখিয়েছে তার সম্যক পরিচয় পাওয়া দরকার। To-day and To-morrow series-এর পুস্তিকাগুলি আমাদের এই ক্ষুধা অনেকটা মেটায়। বাংলা সাহিত্যে বর্ত্তমান জগতের সর্ব্ববিধ সমস্যা নিয়ে গভীর ভাবে বিচার হোক এবং জাতির মনের কুয়াশা এবং অন্ধকার মিলিয়ে যাক—এই প্রার্থনাটুকু মনিষীদের কাছে পৌছে দিতে চাই বলেই এই প্রবন্ধ আরম্ভ করেছিলাম।

আশ্বাস

শ্রীসুশীল মল্লিক

—তবু কেন ক্রন্দন ?
বিরহের বেদনায় হৃদয়ের স্পন্দন ?

জীবনের পরপারে জাগরণ মুক্তির,
মণিকার দ্যুতিটুকু বুকে থাকে শুক্তির।
প্রভাতের আকাশের নীলিমার পরশে
ধরণীর প্রতি গৃহে বাণী তাঁর প্রকাশে।

যায় নাই—দূরে আছে—অই শোন কথা সে,
যুগে যুগে থেকে যাবে পৃথিবীর বাতাসে।
গোপনের আবরণে ঢাকা যদি স্বপনে,
তবু মিছে কাঁদ কেন ? কিবা খেদ স্মরণে ?

বোমার কাহিনী

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

পূর্ব্বানুবৃত্তি

১০৮ অপার সার্কুলার রোড

সার্কুলার রোডের আড্ডায় এসে প্রথমটা আমি একটু অস্বস্ত অনুভব করতে লাগলুম। এক দিকে যতীনদা'র শক্তিমান সত্তার আওতা ও চাপ, আর এক দিকে এই ভবঘুরে আড্ডাধারীর মজলিস। এখানে মানুষ আসে যায়, কোন্ এক সুদূর ভাবী-বিপ্লবের খোস গল্প করে—চা হালুয়া কচুরী সিঙ্গাড়ার অনুপানের সঙ্গ। ছেলেরাও এখানে প্রাতঃ ও সন্ধ্যা ভ্রমনের সময়টার সদ্ব্যবহার করবার লোভে এসে ঘোড়ায় চড়ে, সাইকেল, বক্সিং ও লাঠি খেলা শেখে—নিতান্তই অনাহুত রবাহুতের মত। বড়রা যতীনদাকে ঘিরে পঞ্চমুখ হ'য়ে করে তাঁর স্তুতি আর ছোটরা ভয়ে, সসম্ভ্রমে দূরে দাঁড়িয়ে করে জটুরা। এ রকম আবেষ্টনের মধ্যে এইসব "উড়ো খই গোবিন্দায় নমো" গোছের হাটুরে উপকরণ নিয়ে একটা পাকা সৃষ্টির বনিয়াদ গাঁথা কদ্দুর সম্ভব ? প্রথম কিছু দিন আমি আড্ডায় বসে' বই পড়ি আর তাই ভাবি।

সিষ্টার নিবেদিতা বাঙলার এই প্রথম বিপ্লব-কেন্দ্রটিকে তাঁর লাইব্রেরীর জাতীয়তা বিষয়ের প্রায় এক দেড় শ' বই দিয়েছিলেন। কথা ছিল—রাজনীতির স্কুল করে' ইতিহাস জীবনী ও ডিগবী, রমেশ দত্ত, নৌরজী আদির অর্থনীতির বই প্রভৃতি পড়িয়ে এখানে প্রথমে কতকগুলি পলিটিকাল মিশনরী গড়া হ'বে এবং তার পর নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে তা'দের পাঠিয়ে সমগ্র দেশ বিপ্লবের ছোট বড় মৌচাকে ছেয়ে দেওয়া হ'বে। আমি হলুম প্রথম ছাত্র এই রাজনীতিক ক্লাসের, তার পর জুট্‌লো এসে দেবব্রত, নলিন মিত্র, জ্যোতিশ সমাজপতি, ভূপেন দত্ত, ইন্দ্র নন্দী, এই ধরণের অনেক মানুষ। আমি এসে সখারাম গণেশ দেউস্কর মশাইকে এই বিপ্লব কেন্দ্রটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। দেশে স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দেবার এমন একটা দল আছে শুনে এই শিবাজী-ভক্ত মহারাষ্ট্র-সন্তান তো আনন্দে অধীর। তিনি তখনই এসে যতীনদার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে' গেলেন এবং স্কুলের অর্থনীতির ক্লাসটির শিক্ষার ভার নিলেন।

আমি কিছুকালের জন্যে স্টুপাকার বই-এর মাঝে ডুব দিলুম। পড়তে হবে, জগতের পরাধীন জাতির অভ্যুত্থানের ইতিহাস আমাকে পড়তে হবে, মানুষকে বোঝাবার আগে নিজে বুঝতে হবে যে সশস্ত্র বিপ্লব বিনা গতি নেই, রাজনীতিক মুক্তি বিনা ভারতের উন্নতি অসম্ভব। তখন শিক্ষিত ও ও অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙালীর ধারণা ছিল ইংরাজ রাজত্বের মত' এমন সুসভ্য ও সুনিয়ন্ত্রিত রাজ্য আর নেই, এর প্রতিষ্ঠা ন্যায় ও পরার্থের ওপর, অসভ্য অশিক্ষিত ভারতবাসীকে এঁরা জ্ঞান ও সভ্যতা দিতে এসেছেন। এই ধারণাকে কাটাবার যুক্তি আহরণ করতে হবে ইতিহাস থেকে, অর্থনীতি থেকে, বীর যোদ্ধা ও জাতিগঠক মহাপুরুষের জীবনী থেকে, পুরাণ, মহাভারত থেকে, ধর্ম্ম শাস্ত্র থেকে। আজ ছেলেরা বিপ্লব করতে নেমেই বোমা ফেলে আর মানুষ মারে। আমাদের ওটা ছিল নিতান্তই গৌণ ব্যাপার, আন্দোলনের অনেক পরে নিতান্তই দায়ে পড়ে' ওটা আত্ম-প্রকাশ করেছিল। আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল জাতির মনটিকে গড়া, জাতীয় শিক্ষা, বাঙ্গালীকে নব মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করা। মুক্তি যে চাই এই কথা আগে বোঝাতে হবে, আনতে হবে মানুষের প্রাণে একটা অস্থির, বাঁচবার তীব্র ইচ্ছা, বড় হবার অদম্য প্রেরণা।

মানুষ মারার চেয়ে নিজে মরাটাই আমাদের টেনেছিল বেশি। মৃত্যুর মাঝে আছে জীবনের মন্ত্র, পরার্থে জীবন দান এইটেই আমাদের তখনকার বিপ্লব মন্ত্রকে করে' তুলেছিল এতখানি গৌরবমণ্ডিত ও শক্তিপূত। এখন বুঝেছি আত্মঘাত যত বড় পাপ, নরহত্যা ঠিক তত বড় পাপ। পশুও আপনজনকে চেনে—যতক্ষণ সে কাম ক্রোধের বশে বুদ্ধিভ্রষ্ট না হয়, স্বার্থ যতক্ষণ তাকে গোত্রী-প্রেম ভুলিয়ে না দেয়। ততক্ষণ সেও চলে আপন জাতির সঙ্গে দল বেঁধে, ততক্ষণ সেও আহার খোঁজে আনন্দ খোঁজে দশজনকে সঙ্গে নিয়ে। সমগ্র মানব সমাজ একটা

অখণ্ড একাত্ম সত্তা, তার প্রকৃত কল্যাণ সমগ্রকে নিয়ে, কাউকে হনন করে' নয়। এতখানি তলিয়ে না বুঝলেও এই মানব কল্যাণ মন্ত্র আমাদের বিপ্লবমন্ত্রের মধ্যে নিহিত ছিল। জগৎকে বড় করবো বলেই ভারতকে তুলছি, অন্যকে দলন ও শোষণ করে' মানুষের সভ্যতা বাড়ে না, সবাইকে পোষণ ও পালন করেই তা' হয়।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট যে অবিমিশ্র অত্যাচার এটা বাঙালীকে বোঝাতে আমাদের অনেক তর্ক যুক্তি তোড়জোড়ের আয়োজন করতে হয়েছিল। ক্লাইবের প্রতিমূর্ত্তির নীচে ঐ যে লেখা আছে, "তরবারি দিয়ে আমরা এ রাজ্য পেয়েছি, তরবারির মুখেই তা' রাখতে হবে।" বিজেতা জাতির এই ঔদ্ধত্য—এ দম্ভের বাণীই হয়েছিল আমাদের প্রধান অস্ত্র, ঐটেকে যুক্তির মুখে প্রতিপক্ষের সামনে ফেলে দিয়ে আমরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করতাম—এ রাজাটা নিছক রাক্ষসী অহঙ্কারের প্রতিমূর্ত্তি, পশুবলই এর ভরসা। এর মাঝে ভারতের জন্য যে কোন রকম গৌণ কল্যাণও নিহিত আছে—তাকে ঢাকবার এবং বিকৃত করবার আমাদের ছিল আপ্রাণ চেষ্টা। শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান বিজ্ঞান সভ্যতা উন্নতি যা কিছু হয়েছে তা' ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সদিচ্ছা প্রণোদিত নয়, inspite of the British Government, এই ছিল আমাদের যুক্তির ধারা। আমাদের তুণে সব চেয়ে বড় ব্রহ্মবাণ ছিল ভারতের অর্থনীতির শোষণের কথা—যা' দাদাভাই নৌরজীর UnBritish rule in British India ও দিগবী এবং রমেশ দত্তের ঐ রকম বই থেকে আমরা প্রমাণ করতাম। ইংরাজ রাজ অন্তর্বিপ্লবে ক্ষত বিক্ষত ভারতে শান্তি এনেছে এ যুক্তির বিরুদ্ধে আমরা বলতাম, 'এ শান্তি মৃত্যুরই নামান্তর, যাতে শক্তির চর্চ্চা, জীবনের খেলা নেই সে রকম জোর করে' চেপে রাখবার শান্তি আমাদের হীনবীর্য্য করে' আনছে'।

মিশনরী গঠনের ক্লাস আমাদের পুরোদমে চলতে লাগল। পি মিত্র পড়াতেন ইতিহাস—বিশেষ করে সিপাহী যুদ্ধের শিখযুদ্ধের ও ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস, সখারাম পড়াতেন আর্থিক শোষণের ইতিহাস; যতীনদা' পড়াতেন রণনীতি ও বক্তৃতা দিতেন বিপ্লবের আদর্শ নিয়ে উচ্ছ্বাস ভরা অগ্নিদীপ্ত ভাষায়। ঠাকুরবাড়ীর একজন তরুণ যুবক এসে পড়াতেন নানা জাতির উত্থান পতনের ইতিবৃত্ত—ইটালীর নবজাগরণ, মার্কিণের স্বাধীনতা সমর, আইরিশ মুক্তি-আন্দোলন, ডাচ-রিপাবলিকের কাহিনী ইত্যাদি। এই সব পড়ে' মত্ত ও রুদ্ধ রণঅশ্বের মত আমরা ক্ষিপ্ত হয়েছিলুম এই সব বুদ্ধিরাজ্যের শাণিত অস্ত্র নিয়ে উপযুক্ত প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করবার জন্যে। আমি বোধ হয় প্রথম অভিযানে বের হই বর্দ্ধমানে, সেখানে আমার ঢাকা কলেজের লজিকের প্রফেসার ও আর একজন লোককে বুঝিয়ে আমাদের দলে আনা হয় আমারই চেষ্টায়। তখন মেদিনীপুরে আমার দুই মামার যত্নে একটি বিপ্লব কেন্দ্র গড়া হয়েছে, আমাকে পাঠানো হ'লো এঁদের একবার উৎসাহে তাতিয়ে তোলবার জন্যে। সেইখানে প্রথম আমি পরিচিত হলুম সত্যেন, নিরাপদ, হেমদা' ও আরও অনেকের সঙ্গে।

একটি ছোট্ট ছে'ড়া মাদুরে দেখলাম ছেলেরা শোয় তারই একপাশে মাটির ধূলামাখা কালী ঠাকরুণ অযত্নে দু'টো শুষ্ক জবার নৈবেদ্য সামনে ক'রে রক্তচিহ্না বা'র করে' দাঁড়িয়ে আছেন। এর নাম ছিল 'আনন্দ মঠ' না ঐ রকমের একটা কি। নিরাপদ ছিল বেঁটে গৌরবর্ণ শান্ত প্রায় মৌন অথচ রসিক ছেলে, হাসি তা'র মুখে আর চোখে সদাই খেলতো। খালি পায়ে একটা ময়লা ধুতি ও চাদর গায়ে সে অক্লেশে পাঁচ দশ ক্রোশ পথ হেঁটে যেতো, যখন বসতো তখন গম্ভীর মৌনে হুঁকাটি হাতে বসেই থাকতো চোখের মাঝে কোথায় গোপন কৌতুকের' হাসিটুকু নিয়ে। সত্যেন ছিল দীর্ঘ শ্যামবর্ণ চঞ্চল ছেলে, মুখে তা'র হাঁপানী রোগের যন্ত্রণার ছাপটা দুরপনেয় হ'য়ে বসে' গিয়েছিল; উৎসাহ ও কাজের বেগ তা'র ছিল অসীম অদম্য, চরকীর পাকের মত একটা না একটা কিছু নিয়ে ঘুরছেই। সত্যেন ছিল স্বভাবনেতা, অথচ হাসিমুখে ছেলেদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতায় মাখামাখি করে' তার ছিল নেতৃত্ব। হেমদা' এদের থেকে আর এক প্রকৃতির মানুষ। হাসি রঙ্গরস অমায়িকতা তা'র স্বভাবগত, এমন মিশুক ও মজলিসী মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। বিরলগুম্ফ প্রায় মঙ্গোলীয়ান চেহারা, প্রায় গৌরবর্ণ পুরুষ, সদাই রসিক, সব রকম ভাবের অভিনয়ে দক্ষ, সুগায়ক, ভাল শিকারী ও সাইক্লিষ্ট, পাকা ঝানু সংসারী, এই হচ্ছে আমাদের হেমদার বর্ণনা। এঁদের নিয়েই মেদিনীপুরের সেই দুর্দ্ধর্ষ দলটি গড়ে' উঠেছিল যারা

পরে মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্স ও সুরাট কংগ্রেস ভাঙ্গায় ভূতের নৃত্যের অনুষ্ঠান করে।

ক্ষুদিরাম তখন নিতান্ত লাজুক স্বল্পভাষী গেঁয়ো ছেলে, দু'একবার তা'কে আনন্দমটে দেখেছিলাম বলে' স্মরণ হয়। একবার আমি মেদিনীপুর ঘুরে আসবার পর সত্যেন এসে আমাদের সার্কুলার রোডের আড্ডায় থেকে গেল, আমার কলকাতা আসার আগেই এখানে তা'র যাতায়াত ছিল, সে অসঙ্কোচে যতীনদার বাড়ীর ভেতরেও যেত। এই থেকেই সেই অনর্থের সূত্রপাত হ'লো যার ফলে পরিণামে আমাদের সার্কুলার রোডের আড্ডাটি ভেঙ্গে যায়। সে কথা প্রসঙ্গক্রমে ঠিক যায়গায় বলবো।

আমি মন দিয়ে পড়তে লাগলাম ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডী ও কাভুরের জীবনী, শিখ ও সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস, রমেশদত্ত নৌরজী ও ডিগবীর বই, আইরিশ বিপ্লবের ইতিহাস, ডাচ রিপাবলিক, টডের রাজস্থান, মহারাষ্ট্র অভ্যুত্থানের ইতিহাস, ব্লকের "War made impossible", মার্কিন স্বাধীনতার সমর, গীতা মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব, ইত্যাদি। দিবারাত্র পড়তাম আর নোট নিতাম। এই পড়ার ফলে পরে যুক্তিতর্কে আমি হয়েছিলাম প্রায় অপরাজেয়। মানুষের মন বিপ্লবের দিকে ফেরাবার জন্যে এক এক জন তার্কিকের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিশ্রাম তর্ক করেছি। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ভাই ছিল চালের আড়ৎদার, আলিপুর জেলে সে চাল সরবরাহ করতো। মানুষটি ছিল কালো, কিছু লোমশ ও স্থূল, মজলিসী ও তার্কিক, পান খেয়ে মোটা ঠোঁট লাল ক'রে সে আসর জমকে বসে' যেত যে কোন জটিল বা সূক্ষ্ম বিষয়ের আলাপে। ন—মিত্র ছিল কালো, দোহারা মানুষ, য়ুনিভার্সিটির ভাল এম্ এ ও প্রফেসার, তাদের আপার সার্কুলার রোডের বাসার কাছে মাঠে ছিল তা'দের কুস্তি ও ব্যায়ামের আড্ডা। এ মানুষটির উৎসাহও যেমন ছিল প্রচুর, সাবধানতাও তেমনি যথেষ্ট; মোটা বেতের লাঠি হাতে সে আসতো যেতো সকাল বিকাল আড্ডায় আর হাসিমুখে করতো ছেলে ভাঙিয়ে আড্ডায় ভর্ত্তি করার ব্যবসা।

দেবব্রতকে কে এনেছিল জানি নে, বিরাট স্থূল গম্ভীর অথচ সুরসিক মানুষটি সোণার চশমা চোখে কুঁজো হয়ে সেই যে এসে বসতো, একইভাবে নীরবে শুনে যেত সমান আগ্রহে সবারই কথা। তার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ, সাধনা থাকায় ধৈর্য্যও ছিল অসীম ও অটল, যখন দু'চারটি কথা সে মাথা নেড়ে নেড়ে বলতো তখন আর কারু তা'র উপর কথা বলার উপায় আর থাকতো না। প্রথম থেকেই দেবব্রতের সঙ্গে আমার হয়েছিল সব চেয়ে বেশি মিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম এ মানুষটি সাধারণ থাকের নয়। এরা সবাই প্রথম আঁচড়েই বুঝতে পেরেছিলেন, যে, অনেক সদ্‌গুণ থাকলেও একটি দোষে যতীনদা'র নেতৃত্ব টিকবে না, সে হচ্ছে তাঁর ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা। মনে মনে বুঝলেও সে অসন্তোষ অন্তরালেই তখন ধোঁয়াচ্ছিল, কেউ কারু কাছে মুখ ফুটে এসব কথা তখনও প্রকাশ করেন নি।

ব্যারিষ্টার পি মিত্র ছিলেন আমাদের বাঙলার বিপ্লব-কেন্দ্রের সভাপতি। তাঁর বাড়ী ছিল বোধ হয় ১০৮ লোয়ার সার্কুলার রোডে, নম্বরটা ঠিক মনে নেই, গোরস্থান গুলো পার হয়ে অনেকটা দূরে। তিনি বেঙ্গলীতে 'Om to the Terrible", "Om to The Beautiful" নামে খুব জমকালো উদ্দীপনাময় প্রবন্ধ লিখতেন। আমাদের সার্কুলার রোডের আড্ডায় না এলেও তিনি ক্লাশ নিতেন নিজের বাড়ীতে, আমরা সন্ধ্যায় গিয়ে রাত দশটা অবধি তাঁর অবিশ্রাম বক্তৃতা শুনতাম আর ভারতের অনিবার্য্য মুক্তির কতটা রঙিন স্বপ্ন দেখতাম। মি মিত্র ছিলেন বাঘের মত মানুষ, বলিষ্ঠ বিশাল গণ্ড, তীব্রদৃষ্টি মানুষটির গলার স্বর ছিল গম্ভীর ও উঁচু, গোঁফ ছিল মিলিটারী কেতার, চলন ও ভঙ্গী ছিল দৃপ্ত তেজস্বী সাহেবের। ইনি খুব ভাল লাঠি খেলতে জানতেন।

টাউন্ স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন এই আড্ডার আর এক-জন আড্ডাধারী ও শিক্ষক, তাঁর নাম ছিল মন্মথনাথ চ্যাটার্জ্জি। নাতিদীর্ঘ, গৌরবর্ণ, স্থূল মানুষটির গোল দাড়ি ছিল জর্জ্জ দি ফিফ্‌থ্ প্যাটার্ণের। শান্ত ধীর মন্মথবাবু মনে যে এতখানি আগুণ পোষণ করেন তা তাঁর বাহিরটা দেখে মনে হতো না। এই সব মানুষ নিয়ে আমাদের প্রথম বিপ্লবকেন্দ্র জমকে ছিল মন্দ নয়। (ক্রমশঃ)

মরিস্ শেভ্যালিয়ে

রূপসন্ধানী

শুক্রবার। বেলা সাড়ে তিনটে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বোট্-ট্রেনটি প্যারী ষ্টেশনে এসে পৌঁছবে। প্ল্যাট্‌ফর্মের ওপর অগণ্য জন-সমারোহ। নারী-সংখ্যাই বেশী, হাতে তা'দের ফুলের গোছা, ক্লান্ত মুখে মুগ্ধ হাসি, সাগ্রহ প্রতীক্ষায় দৃষ্টি কাঁপ্‌চে!

মরিস্ শেভ্যালিয়ে

অদূরে ধূমরেখা দেখা গ্যালো। ট্রেণ ষ্টেশনে ঢুক্‌চে! প্রতীক্ষমান জনতার মধ্য দিয়ে চকিতে একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ ব'য়ে গ্যালো যেন! আত্মবিস্মৃতা কয়েকটি উন্মাদিনী নারী রেল-পথের ওপর দিয়ে ছুটতে সুরু করল, তা'দের অনুসরণ করেচে সমগ্র জনতা! বিপদের সঙ্কেত জানিয়ে লাল পতাকা উড়্‌ল, রেল-কর্ম্মচারীদের চীৎকার, নিষেধ···কিন্তু শুন্‌বে কে? ট্রেণের চারপাশে তখন আর জনতা নয়, জন-জোয়ার। প্যারীর অধিবাসী আজ যেন একটি নতুন তারা আবিষ্কার করেচে, বা শুনেচে অফিয়াদের বাঁশরী! মাথার ওপর অসংখ্য ক্যামেরা উঠ্‌ল উঁচু হয়ে, দেখা গ্যালো একজন 'ম্যুজি অপারেটর'-এর হাত থেকে টস্-টস্ রক্ত পড়চে পার্শ্ববর্ত্তীর টুপীর ওপর! সেই মোহমত্ত জনসঙ্ঘের তলায় ক্ষীণাঙ্গী দু'টি নারী গ্যালো পদদলিত হ'য়ে—!

অজস্র পুষ্পবর্ষণ ও অভিনন্দনধ্বনির মাঝে ট্রেণ-কামরার বাতায়ন-পথে দেখা দিল একখানি মুখ, ঠোঁটে তা'র বহু-পরিচিত অদ্ভুৎ হাসি। সে-হাসিকে উপলব্ধি করা যায়, ব্যাখ্যা করা চলে না!

এই নবাগত আগন্তুকটির নাম মরিস্ শেভালিয়ে,—Idol of Paris—প্যারীবাসীদের মানস-দেবতা।

দূরে প্ল্যাট্‌ফর্মের প্রান্তে চার-পাঁচটি বয়স্কা মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই নবাগত অতিথি তাঁদের দৃষ্টির সুমুখে বারো-বছরের একটি বালকে রূপান্তরিত হয়ে গ্যালো! বারো-বছরের সেই ছোট ছেলেটি একসময় এই প্যারীর পথে পথেই ঘুরে বেড়াত, এলো-মেলো চুল, পোষাকের নেই পারিপাট্য, মুখে সেই অপূর্ব্ব অদ্ভুৎ হাসি!

ছেলেটি নাকি গান গাইত চমৎকার। প্রকাশ্য-সভায় সে প্রথম গান শোনায় Trois Lions এ—প্যারীর ছোট-খাট একটি কন্সার্ট হলে। এরপর Casino de Toureelles এ সে স্বল্পকালস্থায়ী একটি কাজ পায়, মাইনে হ'ল ফি-সন্ধ্যায় তিন শিলিং ক'রে। ছেলেটি তখন তেরোয় পা দিয়েচে। সেখানকার কাজ ফুরোবার পর সে এক ভ্রাম্যমান দলে কাজ জুটিয়ে যাযাবর-বৃত্তি অবলম্বণ করলে। বছর কয়েক পথ-জীবন কাটাবার পর প্যারী নগরী তা'কে আবার ডাক দিলে। সুর-শিল্পী ও নট হিসেবে তখন কিছু কিছু তা'র নাম শোনা যায়। তা' ছাড়া, এতকাল ঘুরে ঘুরে' বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন রুচির লোকের সঙ্গে মিশে' সে মানুষের মনোবিজ্ঞানটি আয়ত্ত ক'রে ফেলেচে।

পারীতে ফিরে আস্‌বার পর তা'কে Folies-এর Bergere নাটমঞ্চে দেখা গ্যালো, সঙ্গে প্যারীর যশস্বিনী

নটিনী মিসিঙ্গায়েৎ। মিসিঙ্গায়েৎ-এর চারুচরণ তখন পৃথিবী-বিখ্যাত এবং দশহাজার পাউণ্ড দামে ইন্স্যুরেন্স করা! সেই তরুণ সুর-শিল্পীর সঙ্গে নর্ত্তকী মিসিঙ্গায়েৎ-এর সহযোগিতা প্যারীর বুকে এক নবস্পন্দনের সঞ্চার করলে। প্যারীর গীতশালায় বহু মুগ্ধ নর-নারীর মুখে মুখে তা'দের নাম ঘুরে' বেড়ায়—!

কিন্তু ১৯১৩ সালে সেই তরুণ সুর-শিল্পীকে প্যারীর গীতশালায় হঠাৎ আর দেখা গ্যালো না। সে তখন সেনা-বিভাগে যুদ্ধবিদ্যা শিখ্‌ছে—বরং বলা ভালো, দেশাচার অনুসারে তা'কে শিখ্‌তে হচ্চে। কিন্তু ভালো ক'রে শেখ্‌বার আগেই বাধ্‌ল মহাযুদ্ধ। যুদ্ধ বাধ্‌বার কয়েক সপ্তাহ পরে দেখা গ্যালো একটি ট্রেঞ্চের মধ্যে শ্র্যাপ্‌নেল্ ফেটেচে; এবং প্যারীর সেই সুর-দেবতা নাটমঞ্চের বদলে ট্রেঞ্চের কারায় শায়িত, মুখ দিয়ে গড়াচ্ছে রক্ত! অল্পক্ষণ পরেই জার্ম্মান য়্যাম্বুলেন্সের লোক এসে তা'কে বন্দীশালার হাঁসপাতালে নিয়ে গ্যালো।

আঘাত তা'র অবিশ্যি গুরুতর হয় নি, কিন্তু বন্দী হয়ে তা'কে থাক্‌তে হ'য়েছিল দু'বছরেরও বেশী। সেই বন্দীশালায় জো ব্রিজ নামে একটি লোকের সঙ্গে তা'র আলাপ হয়। জো একসময় লণ্ডনের গীতশালার বহুবাঞ্ছিত অতিথি ছিল। ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী সঙ্গীত সে এই জো-র কাছ থেকেই আয়ত্ত করেছিল।

মহাযুদ্ধের তখন অবসান হয়ে আস্‌চে। সেই সময় ঘটনাচক্রে সেই দু'টি বন্দী 'রেড্-ক্রশ' কর্ম্মীর ছদ্মবেশে জার্ম্মান তাঁবু থেকে পালায়। বহু বর্ষ পরে প্যারীর গীত-শালায় সেই তরুণ গীত-দেবতার পুনরাবির্ভাব হ'ল।

কিন্তু বারো-বছরের সেই অখ্যাত-নামা অজ্ঞাত-পরিচয় ছেলেটির আজ মৃত্যু ঘটেচে! আজ যে বেঁচে রয়েচে, সে অপরিমিত ঐশ্বর্য্যশালী, যশ-ক্লান্ত, বহু-বল্লভ!

আজ বেঁচে আছে মরিস্ শেভালিয়ে—।

হ্যানেন্ দোয়াদারের ভাষায়: 'Luckiest man in the world' হচ্চেন মরিস্! তাঁ'র আয়ের পরিমাণ আমাদের ধারণার অতীত;—হলিউডে একটি চিত্র-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন সপ্তাহে হাজার পাউণ্ড, প্যারীর একটি রঙ্গালয়ে পোনেরো দিনের কাজের দাম হিসেবে তিনি নিয়েছিলেন এক মিলিয়ন ফ্রাঁ! যশেরও তাঁ'র অন্ত নেই; শুধু দেশ-বিদেশের গীতশালায় নয়, ছায়াজগতেও মরিসের অগণ্য অনুরাগী তাঁ'র নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে একটি মোহ অনুভব করে।

কিন্তু কেন?

রুডল্‌ফ্ ভ্যালন্টিনোর মতো বা র‍্যামন্ নোভারোর মতো অপূর্ব্ব দেহ-শ্রী তো তাঁর নেই! তবু, মানুষের মনোরাজ্যের ওপর মরিস্ আধিপত্য বিস্তার করেন কেমন ক'রে? এর কারণ, তাঁ'র আশ্চর্য্য স্বাভাবিকতা। নাট-মঞ্চের মরিস্ ও ড্রয়িং রুমের মরিসের মধ্যে তফাৎ খুঁজে পাওয়া মুস্কিল! তাঁ'র বহুচিত্তজয়ের কারণ Sex-appeal নয়,—high spirt, মরিস্ যখন অভিনয় করেন, তখন তাঁ'র মুখ, চোখ, হাত, সর্ব্ব অবয়ব অভিনয় করে এবং তাঁ'র সমস্ত অভিনয়ের আভাস থেকে আত্মপ্রকাশ করে একটি চমৎকার দিল্‌দার মানুষ! সে-মানুষটিকে হয় তো তোমার ভালো লাগ্‌তে না-পারে, কিন্তু তা'কে অস্বীকার করতে তুমি পারবে না।—মরিসের জিৎ এইখানেই।

তবু অপরিমিত অর্থশালী এই দিল্‌দার লোকটির মুখেই শোনা গ্যাচে:

'I have grown rich, but am all in. I'll go now to my cottage at La Boca near cannes,'

কিন্তু শুধু মরিসের মুখেই নয় এ অকপট স্বীকারোক্তি আরও বহু মুখে শোনা গ্যাচে। জীবনের পানপাত্র যাদের ফেণোচ্ছল তা'দেরই তৃষ্ণা তৃপ্তি খুঁজে পায় না—জীবনের এটি সব চেয়ে বিস্ময়কর সত্য।

বহু-বল্লভ মরিস্ নারীদের সম্বন্ধে ভারি মজার একটা কথা বলেচেন:

I am not a ladies' man but a man of one lady; and she is a little French girl.'

সেই ছোট্ট ফরাসী মেয়েটি মরিসের স্ত্রী

———o———

"শেষের কবিতা"

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ নন্দী

"শেষের কবিতা" একখানি গদ্য-কাব্য। উপন্যাস বলে' বিচার করলে একে ভুল করা হ'বে। উপন্যাসের গতানুগতিক চরিত্র বিশ্লেষণ এ'তে নেই। যে-বিরুদ্ধ প্রকৃতির ঘাত প্রতিঘাতে মানব-চরিত্র সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে তার সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণে এর পৃষ্ঠা ভারাক্রান্ত হয়নি; মূলতঃ এতে নায়ক নায়িকার রঙিন্ কল্পনা, তাদের আবেগ-উজ্জ্বল ভাবপ্রবণতা রূপ পেয়েছে। এর ভাবে ভাষায় ছন্দ লীলায়িত হ'য়ে ওঠে। কোথাও ঔপন্যাসিকের অতি-সাবধানী কালির আঁচড় নেই,—আছে কবির তুলির মোহনীয়তা। এর প্রকৃতিতে রয়েছে গীতি-কাব্যের ফাগুণ-স্পর্শ।

"ফিলজফি" হিসেবে রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের লেখা "মহুয়া" ও "শেষের কবিতা"র মধ্যে একটা মিল দেখা যায়। "মহুয়ার" ফুল-বনে কবি যে-"অবিস্মরণীয়" প্রেমের গান গেয়েছেন, তাকেই "শেষের-কবিতা"র চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। "মহুয়া"র কবি যে-প্রেমের আভাষ দিয়েছেন, তা সাধারণতঃ সৃষ্টি-মূলক। এই সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া পুরুষের মধ্যে প্রবল। পুরুষ তার সমস্ত শক্তি নিয়ে সৃষ্টি করেই চলেছে, কিন্তু নারীর কাজ রক্ষা। পুরুষের উদ্দাম সৃষ্টিশক্তির তালে তাল্ ঠুকে নারী চল্‌তে পারেনা, থাকে পেছনে পড়ে'। আবার নারী যদি পুরুষকে ধরে' রাখে তবে সৃষ্টি হয় পঙ্গু। এ কথাটা আরও স্পষ্ট করে' রবীন্দ্রনাথ অমিতর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন।

"পুরুষ তা'র সমস্ত শক্তিকে সার্থক করে সৃষ্টি করতে, সেই সৃষ্টি আপনাকে এগিয়ে দেবার জন্যই আপনাকে পদে পদে ভোলে। মেয়ে তা'র সমস্ত শক্তি খাটায় রক্ষা করতে, পুরোণোকে রক্ষা করবার জন্যেই নতুন সৃষ্টিকে সে বাধা দেয়। রক্ষার প্রতি সৃষ্টি নিষ্ঠুর, সৃষ্টির প্রতি রক্ষা বিঘ্ন।.....এক জায়গায় এরা পরস্পরকে আঘাত করবেই। যেখানে খুব ক'রে মিল, সেখানেই মস্ত বিরুদ্ধতা।"

তাই রবীন্দ্রনাথের "প্রেমে" মিলনের স্থানটা বড় সঙ্কীর্ণ। মিলন মিলনই নয় যদি সে মিলন প্রেমিক-প্রেমিকার আত্ম-বিকাশের পক্ষে বিঘ্ন স্বরূপ হয়। তা'র মতে প্রেমের চাইতে বড় জিনিষ আত্ম-বিকাশ, মিলনের চাইতে শ্রেষ্ঠতর মুক্তি। "আমাদের সকলের চেয়ে বড় যে-পাওনা, সে মিলন নয়, সে মুক্তি।" রবীন্দ্রনাথের প্রেমিকা সে কথা বুঝে, তাই প্রিয়তমকে বিদায় দিতে কষ্ট হ'লেও সে কুণ্ঠিত নয়!

"চিরকাল র'বে মোর প্রেমের কাঙাল
এ কথা বলিতে চাও বোলো।
এই ক্ষণটুকু হোক্ সেই চিরকাল;
তা'র পরে যদি তুমি ভোলো
মনে করাবো না আমি শপথ তোমার,
আসা যাওয়া দু'দিকেই খোলা র'বে দ্বার,
যাবার সময় হ'লে যেয়ো সহজেই
আবার আসিতে হয় এসো।
সংশয় যদি রয় তাহে ক্ষতি নেই
তবু ভালোবাসো যদি বেসো।"

(মহুয়া)

কারণ বিরহ মানেই ভুলে যাওয়া নয়। আত্মায় আত্মায় যে-প্রেম তা বিচ্ছেদের মাঝেও অটুট থাকে—রবীন্দ্রনাথের নায়িকা তা জানে:—

"যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন,
যা পাইনি বড় সেই নয়
চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন
চিরবিচ্ছেদ করি' জয়।"

(মহুয়া)

রবীন্দ্রনাথের বিরহ বিরাগ নয়, ত্যাগ,—অন্ধকার নয়, আলোর হোম-শিখা। তা'তে মৃত্যুর পাণ্ডুতা নেই, আছে অনন্তের নিবিড়স্পর্শ।

কবি-কল্পনার সেই ভাব-ভোলা প্রেমিকটি হ'ল অমিত। অমিত কবি—স্রষ্টা। কিন্তু তা বলে' মূক প্রকৃতি নিয়ে তা'র বেশীক্ষণ চলেনা। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বা শেলির মত প্রকৃতির মধ্যে "অশরীরী আনন্দে"র সন্ধান সে পায়নি। সে চায় তা'র মানসী-প্রতিমা রূপ নিয়ে তা'র কাছে এসে দাঁড়াক্, যার প্রতি পাদক্ষেপে তা'র হৃদয়ের ছন্দ ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌বে, প্রাণে লাগ্‌বে রঙের ঢেউ! সেই "একে"র অভাবে অমিত যখন নিতান্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ছিলো, এমনি সময়ে এক নববর্ষার দিনে লাবণ্যর সঙ্গে ঘট্‌লো তার হঠাৎ-পরিচয়। লাবণ্যর মুখে অমিত তা'র অচেনা প্রেয়সীকে দেখ্‌তে পেলে। সেই রূপ-লক্ষ্মীর সোণার কাঠির স্পর্শে জেগে উঠে অমিত দেখলে তা'র নবজন্ম হয়েছে। প্রকৃতির আনন্দ এসে তা'র প্রাণের প্রাচুর্য্যের সঙ্গে যোগ দিলে। সেদিন প্রভাতালোকে দেবদারু গাছের ঝালরগুলো যে কেঁপে উঠ্‌লো আর লাল মেঘগুলোর বুকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে সোণার নিকষ-রেখা জলে উঠ্‌লো, তা দেখে ও আজ আত্মস্থ হ'য়ে রইলো। আকাশের আলো তা'র রক্তের মধ্যে প্রবেশ ক'রে যে-উত্তেজনার সৃষ্টি করলে, তা'তে তা'র শরীরটা বাঁশী হয়ে বাজ্‌তে লাগ্‌লো।

শিলঙের স্বপ্নময় আবেষ্টনীর মধ্যে, য়ুক্যালিপটাস্ গাছের ছায়ায় ব'সে অমিত লাবণ্যকে আপন মনের রসে রসিয়ে দেখ্‌লে—হৃদয়ের মানিক মুকুতা দিয়ে তা'কে সাজালে। অমিত যে-দিন প্রথম আবিষ্কার করলে জীব-জগতে পাখী আছে, এমন কি তা'রা গানও গায়। অমিত শুন্‌লে আকাশের সাথে পৃথিবীর নাম ধ'রে ডাকাডাকি চলে—সেও তা'র বঁধুর একটি নাম সৃষ্টি করলে, "বন্যা", আর তা'র মুখে নিজের নামটিও শুনে' নিলে—"শিতা"। লাবণ্য ঝরণার স্বচ্ছ ধারায় আপনার ছায়াকে ছুলিয়ে' ছুলিয়ে' খেলা দেখ্‌লে, আঙুলে আঙুল মিলিয়ে লিখলে কবিতা। কিন্তু দু'দিন না যেতেই লাবণ্য বুঝ্‌তে পারলে, অমিত যাকে চায় সে রক্ত মাংসে গড়া লাবণ্য নয়, তার মাঝে যে কল্প-লতাকে সে দেখেছে তাকেই। এইখানেই পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রভেদ সুস্পষ্ট। নিছক কল্পনা-প্রবণতা (idealism) ব'লে কোন জিনিষ মেয়েদের মধ্যে নেই। তাদের যা কল্পনা, আশা-আকাঙ্খা দেহকে আশ্রয় করে'ই—"দেহকে বানিয়ে তোল্‌বার আকাঙ্খা ওদের রক্ত মাংসে," তা'দের ভাব-জগৎ জড়-জগতের মধ্যেই, তাদের ভাবুকতা জীবনের প্রয়োজনের জন্যেই।

লাবণ্য অমিতকে বল্‌ছে,—

"জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালাতে আমার মন যায় না। জগতে যা'রা উৎসব-সভা সাজাবার হুকুম পেয়েচে কথা তা'দের পক্ষেই ভালো। আমার জীবনের তাপ জীবনের কাজের জন্যেই।"

কিন্তু পুরুষের ভাবজগৎ আর বস্তুতান্ত্রিক জগতের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। তাদের কল্পনা প্রায়ই মর্ত্ত্যের মাটি ছোঁয় না। অমিত আবার কবি। বস্তুজগতে বাস করলেও কবিরা বস্তুজগতের ঊর্দ্ধে কোন মানস-লোকের যাত্রী। তা'দের সূক্ষ্মদৃষ্টি দেহকে ভেদ করে' দেহাতীতকে খোঁজে ফেরে। লাবণ্যকে অমিত যখন দেখে, তখন তার দেহটার প্রতি মোটেই সে সচেতন ছিল না। রূপ-রস-গন্ধের যে-লাবণ্য, যে-লাবণ্য তার সৃষ্টিশক্তিকে জাগিয়েছিলো, যার প্রেরণায় সে গেয়েছে আর গেয়েছে, বলেছে আর বলেছে, সেই লাবণ্যকে সে দেখেছিলো। লাবণ্য তা বুঝেছিলো, আর বুঝেছিলো বলে'ই অমিত যখন বিয়ের প্রস্তাব করলে, আর যোগমায়া এসে পীড়াপীড়ি করতে লাগ্‌লো, তখন সে বল্‌লে, "কিন্তু উনি তো আমাকে চান্‌না। যে-আমি সাধারণ মানুষ, ঘরের মেয়ে, তাকে উনি দেখতে পেয়েচেন ব'লে মনেই করিনে। আমি যেই ওঁর মনকে স্পর্শ ক'রেচি অমনি ওঁর মন অবিরাম ও অজস্র কথা ক'য়ে উঠেছে। সেই কথা দিয়ে উনি কেবলি আমাকে গ'ড়ে তুলেচেন। ওঁর মন যদি ক্লান্ত হয়, কথা যদি ফুরোয়, তবে সেই নিঃশব্দের ভিতরে ধরা প'ড়বে এই নিতান্ত সাধারণ মেয়ে, যে-মেয়ে ওঁর নিজের সৃষ্টি নয়। বিয়ে ক'রলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গ'ড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।"

যোগমায়া জিজ্ঞেস্ করলে "তুমি কী চাও?"

লাবণ্য উত্তর করলে, "যতোদিন পারি, না হয় ওঁর কথার সঙ্গে, ওঁর মনের খেলার সঙ্গে মিশিয়ে স্বপ্ন হ'য়েই থাকবো। আর স্বপ্নই বা তাকে বল্‌বো কেন? সে আমার একটা বিশেষ জন্ম, একটা বিশেষ রূপ, একটা বিশেষ জগতে সে সত্য হ'য়ে দেখা দিয়েচে। না হয় সে, গুটি থেকে বের হ'য়ে আসা দু'-চারদিনের একটা রঙীন্ প্রজাপতিই হ'লো,

তা'তে দোষ কী—জগতে প্রজাপতি আর কিছুর চেয়ে যে কম সত্য তা তো নয়……"

অমিত ঘর বানালে, তারপর নববধূকে ডেকে বল্‌লে, ওগো, তুমি এসো। বধূ এলো না। অমিত কিন্তু দমলে না; সে তখন কৃচ্ছ্র সাধনায় প্রবৃত্ত হ'লো। ধরা তাই লাবণ্যকে দিতেই হ'লো। লাবণ্য নারী, অমিতর কৃচ্ছ্র-সাধনার কথা সে যখন শুন্‌লে, সকল বাধা-বিঘ্ন ছাপিয়ে নারীসুলভ অনুকম্পা তা'র হৃদয়ে জেগে উঠ্‌লো। শেষে অনুকম্পারই হ'লো জয়,—অমিত দুঃখবরণ দ্বারা লাবণ্যকে করলে আপন।

ধরা দিলেও লাবণ্যর সন্দেহ রয়েই গেলো, লৌকিক মিলন তাদের কোনোমতেই হ'তে পারে না। তাই অমিত যখন কল্‌কাতায় যাবার জন্যে এসে বিদায় চাইলে লাবণ্যর মন বল্‌লে, এখান থেকেই তাদের বিচ্ছেদের আরম্ভ, মিলনের অবসান। লাবণ্য আবৃত্তি করলে।

"তোমারে দিইনি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেছ রাখি'
রজনীর শুভ্র অবসানে।……"

"……শুধু সে মুক্তির ডালাখানি,
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি।"

লাবণ্যর নারী-হৃদয় অন্তরে-অন্তরে যা অনুভব করেছিলো, তাই পরদিন সত্য হ'য়ে প্রকাশ পেলো সিসিলিসিদের শিলঙ্ আসার অভাবনীয় খবরে। যে-অমিত এতদিন লাবণ্যর সমস্ত আশঙ্কাকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, তারও মনে কী এক দুর্ঘটনার ছায়াপাত হ'লো। এতদিন অমিত লাবণ্যকে তা'র কল্প-লোকের সঙ্গিনী ব'লে জেনেছে, কাজেই তাকে আপনার করে' সেবার কল্পনায় তা'কে বাধে নি। সে-দিন সিসি-কেটিদের শুভাগমনের খবরে, তার নিজেরও যে একটা বাস্তব দিক আছে, তা সে যেন নতুন আবিষ্কার করলো। অমিত ভেবে দেখ্‌লে তা'র যে-সমাজ সেখানে লাবণ্যকে কোনো মতেই খাপ খাওয়ানো যায় না—লাবণ্য সে দূষিত আবহাওয়ার অনেক উর্দ্ধে। এখানে রবীন্দ্রনাথের শকুন্তলা" সমালোচনার একটা জায়গা মনে পড়ে। দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক শকুন্তলাকে প্রত্যা-খ্যানের কথা উল্লেখ করে' রবীন্দ্রনাথ বলেন, কালিদাস শকুন্তলাকে রাজ-অন্তঃপুরে নিয়ে যান্‌নি, কারণ সেখানকার কৃত্রিম আবহাওয়া প্রকৃতি-কন্যা শকুন্তলার অনুকূল নয়। কৃত্রিম ও অকৃত্রিমের যে তফাৎ, সিসিলিসিও লাবণ্যর সমাজের মধ্যেও সেই প্রভেদ। লাবণ্য যে-জগতের প্রাণী সেখানকার জলে স্থলে যে শান্ত-সারল্যের অভাব পাওয়া যায়, তাই লাবণ্যর প্রকৃতিতে প্রবেশ করে' তা'কে পরিপুষ্ট করেছে। তা'র আচারে ব্যবহারে, কথা বার্ত্তায় তাই একটি অকৃত্রিমতা, একটি সুষ্ঠু শ্রীর পরিচয় মেলে, যা সমাজের বাস্তব গণ্ডীর মাঝে অসম্ভব। সিসিলিসিদের সমাজের রঙ্ তাদের "এনামেল-করা" মুখে লেগেছে; সেখানে লাবণ্য একদিনও বাঁচ্‌তে পারে না। সমাজের কৃত্রিম অনুশাসনের মধ্যে বাস করেও অমিত যে বেঁচে ছিলো, তা'র কারণ তা'র প্রাণের অফুরন্ত সজীবতা, তা'র ভাবপ্রবণতা। প্রকৃতির স্পর্শে সমস্ত কৃত্রিমতার আবরণ খসিয়ে সবুজ হ'তে পেরেছিলো বলেই লাবণ্যর সাথে তা'র মিলন সম্ভব হয়েছিলো। লাবণ্য যে-অমিতর পরিচয় পেয়েছিলো, সে এই অকৃত্রিম অমিত, সিসিলিসির "এনামেল-করা" সমাজের অমিত নয়। তাই সিসিলিসিরা যখন জিজ্ঞেস্ করলে, "আমিট্রায়ে"কে সে চেনে কিনা, লাবণ্য থতমত খেয়ে উত্তর দিলে "না।" প্রকৃতি কৃত্রিমকে অস্বীকার করলে। লাবণ্য মিথ্যা বলেনি।

এতদিনে অমিত বুঝ্‌তে পার্‌লে, লাবণ্যকে তা'র হারাতে হবেই, মনে মনে সে তার জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলো। অবশেষে সে দুর্দ্দিন এলো। বাসরঘর জম্‌তে না জম্‌তেই কোথাকার এক প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে গেলো। লাবণ্য দেখ্‌লে অমিত যেখানে বাস্তব জগতের মানুষ সেখানে সে অনেকদিন আগেই বাগ্‌দত্ত। সেখানে নিজের অধিকারকে নিয়ে যাওয়া সঙ্গত হ'বেনা। লাবণ্য পালালো।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, পুরুষের দুটো দিক্। একদিকে সে স্রষ্টা, অন্যদিকে সে সামাজিক জীব। দেহ ছাড়া প্রাণ যেমন বাঁচ্‌তে পারে না, তেমনি সামাজিক পুরুষকে বাদ দিয়ে স্রষ্টা-পুরুষ বেঁচে থাক্‌তে পারে না। অমিতর মধ্যেও এ দুটো বৃত্তি প্রবল। শিলঙ্ পাহাড়ের যে-অমিত সে স্রষ্টা; সেই স্রষ্টা যখন আবার সমাজ বন্ধনের মধ্যে ফির' এলো, তাকে বাঁচবার জন্য কেতকীকে বরণ ক'রে নিতে হ'লো। আর লাবণ্য? চিরকালের জন্যে সে অমিতর কল্পলোকের সঙ্গিনী হ'য়ে রইলো। তা'র গানে, তা'র কবিতায়, তা'র নিভৃত সাধনায়, লাবণ্য দেবে প্রবৃত্তি।

যখন কোনো জ্যোৎস্না-বিকশিত রজনীতে বসন্ত-বাতাসে আর দেবদারু-মর্ম্মরে তাঁর প্রাণের মানুষটি জেগে উঠে' মানসের পথে যাত্রা কর্‌বে,—সে পথে শুন্‌বে সে তা'র প্রিয়ার পায়ের নূপুর-নিক্কন, তা'র হৃদয়কে আকুল করে দেবে' লাবণ্যের চুলের কস্তুরী-গন্ধ। অমিতর অন্তরে লাবণ্য, বাইরে কেতকী। অমিতর নিজের কথায়—

"আমি রোমান্সের পরমহংস। ভালোবাসার সত্যকে আমি একই শক্তিতে জলে স্থলে উপলব্ধি কর্‌বো, আবার আকাশেও। নদীর চরে রইলো আমার পাকা দখল, আবার মানসের দিকে যখন যাত্রা কর্‌বো সেটা হ'বে আকাশের ফাঁকা রাস্তায়।"

অমিতর কথায় মনে পড়ে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সেই বাণী।

—"A type of the wise who soar, but
never roam
True to the kindred points of Heaven
and Home—"

অমিত শুধু ব্যক্তিবিশেষ নয়, অমিত মানব-মনের প্রতীক্। মানুষ চিরকাল শুধু জড় জগৎকে নিয়ে থাক্‌তে পারেনা। সমাজের কৃত্রিম অনুশাসন তা'র হৃদয়কে ঠেসে' ধরে—সে চায় মুক্তি, কিন্তু জড় প্রকৃতির গণ্ডীর ভিতর সে মুক্তি পেতে পারে না, তাই তার কান্নাও থামে না। এমনি ক'রে অনেক ঘুরে ক্লান্ত ব্যথিত মানুষটি প্রকৃতির দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে বলে, বাণী দাও, ওগো বাণী দাও। মানব-চিত্তের সেই অশান্ত ভাবুক অমিত রায় ইস্পাতে-গড়া সমাজের মাঝে এক'কে খোঁজে,—পায় না; কারণ সমাজের "কাটা খাল বেয়ে বাঁধা ঘাটে" "দেখাশোনা হয়, চেনাশোনা হয় না।" মাঝে জ্যোৎস্নালোকিত রজনীতে সে মুহূর্ত্তের জন্যে কাছে দাঁড়ায়, কিন্তু ধরা দেয় না। এই বিক্ষুব্ধ হৃদয় নিয়ে অমিত প্রকৃতির রঙ্গভূমি শিলঙে এসে আঘাত করলে। সে আঘাতে দ্বার খুলে গেল—অমিত দেখ্‌তে পেলে লাবণ্যকে। অমিতর কাছে—

"She seemed a thing that could not feel
The touch of earthly years,"

অমিত দেখ্‌লে যাকে এতদিন সে খুঁজেছিলো, এইত সেই! সে জড়জগৎকে ডেকে বল্‌লে।

"For God's sake hold your tongue
and let me love"

কারণ—

"Umpluses of deeper birth
Have come to him in solitude"

মানব মন প্রকৃতির অন্তরে প্রবেশ করে' ভূমার আনন্দে মগ্ন হ'য়ে রইলো।

এই প্রকৃতির স্পর্শে মানুষের নবজন্ম হয়, তা'র সমস্ত কৃত্রিমতা ঘুচে গিয়ে, তা'র মনের উপরের রঙ্‌টা হয় প্রকৃতিরই অনুরূপ। প্রকৃতির সংস্পর্শে মানুষের মনের এই যে পরিবর্ত্তন, তার কথা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকল কবিই স্বীকার করেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁর "লুসি" কবিতায় এ পরিবর্ত্তনের কথা উল্লেখ করে' গেছেন। তাঁর মানসী প্রতিমা "লুসি" সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,

"And hers the Silence and calm
Of mute insensate things,"

অমিতরও এমনি একটা পরিবর্ত্তন সিসি-কেটির লক্ষ্য করেছিলো। "সব শুষ্ক ওর ওপর যেন গাছপালার আমেজ দিয়েচে, ও যেন কাঁচা হ'য়ে গেছে……"

প্রকৃতির আনন্দে আকণ্ঠ নিমজ্জিত মানুষের মন্ তো জড়-জগৎকে বল্‌লে "Hold your tongue." কিন্তু Hold your tongue," বল্‌লেই শোনে কে? জড়জগতের কোলাহল তা'র কর্ণে প্রবেশ করে, তা'র ধ্যান ভেঙে যায়। অমিতর এই ধ্যানও একদিন ভেঙে গেল জড়-জগতের সিসিলিসিদের আবির্ভাবে। ধ্যান ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই তা'র ধ্যানের প্রতিমার হ'লো তিরোধান, আর তা'র হৃদয় সহসা এক তীব্র ব্যথায় কেঁদে উঠ্‌লো,

"Fled is that music :—do I wake or sleep."

তারপর ভেরে দেখ্‌লে যাকে পেয়েছিল, তাকে ত হারায়নি। তার ছবি যে চিরকালের জন্যে বুকে আঁকা রইলো। অমিত লিখ্‌লে:

"তব অন্তর্দ্ধান পটে হেরি তব রূপ চিরন্তন,
অন্তরে অলক্ষ্য-লোকে তোমার অন্তিম আগমন।
লভিয়াছি চিরস্পর্শমণি;
আমার শূন্যতা তুমি পূর্ণ করি' গিয়েছো আপনি।"

মানব-মন প্রকৃতির আনন্দ থেকে জড়-জগতে ফিরে এলো কিন্তু প্রকৃতির যে সবুজস্পর্শ সে বুকে বয়ে নিয়ে এলো, মর্ত্ত্যের ধূলোয় তা কখনো ম্লান হ'তে না।

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের প্রায় সমস্ত কবিতাতেই একটা চলার রেশ লেগেছে। রবীন্দ্রনাথের মতে আনন্দ হ'তেই সৃষ্টির উৎপত্তি, আর এই সৃষ্টিধারা অনন্তকাল ধরেই চলেছে ও চল্‌বে। ঐ সৃষ্টির ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে চলাই মানুষের জীবনের পরম লক্ষ্য! আর ঐ চলাকেই তিনি বলেছেন, পথ-চলা। পৃথিবীতে যা'রা চল্‌তে শিখেছেন, অর্থাৎ পৃথিবীর অন্তর্নিগূঢ় আনন্দের সাথে আপনার যোগ সাধন কর্‌তে পেরেছেন, তারাই শুধু জীবনকে উপভোগ কর্‌তে পারেন। তারাই চির-নবীন। যারা ও-আনন্দ থেকে বঞ্চিত তা'রা জীবন্মৃত! মহুয়ার "পথবর্ত্তী" নামক কবিতায় এ ভাবটি তিনি একটু ঘুরিয়ে বলেছেন। "দূর মন্দিরে সিন্ধুকিনারে" পুরুষ চলেছে, নারী সেই পথ-প্রান্তের তরু। পথ চল্‌তে চল্‌তে পথিক তার তলায় খানিক বিশ্রাম করে; কিন্তু সে থাকে না—আবার চলে। চলাই যে তার রীতি। যাবার সময় তা'র মন-সাজি ভ'রে উঠে "ফুলের গন্ধধূপে"; "শেষের কবিতা"ও এই পথের কবিতা।

শেষের কবিতার নায়ক অমিত রায় চলে। তার কথাবার্ত্তায় চালচলনে অস্থিরতা উপ্‌চে পড়ে, তা'র টীকা টিপ্পনি মতামতে একটা সচল সজীবতা সর্ব্বক্ষণ প্রকাশ পায়। তার উপর অমিত নতুনের কবি। যা'রা চল্‌তে জানে না, তা'রাই পুরোণোকে প্রাণপণে আঁক্‌ড়ে ধরে' থাকে। অমিতর মন সচল, তাই বৃদ্ধ রবিঠাকুরকে সাহিত্য-সম্রাটের আসন থেকে জোর করে' নাবিয়ে সে সে-সিংহাসনে নিবারণ চক্রবর্ত্তীকে বসাতে চায়। তা'র মতে "কবি মাত্রেরই উচিত পাঁচ বছরের মেয়াদে কবিত্ব করা;" যদি কেউ সে নিয়মের ব্যতিক্রম করে তবে আমাদের উচিত দল বেঁধে ওর সভা ছেড়ে উঠে আসা। পুরোণো কবি ভাল লিখুক, আর নতুন কবি খারাপ লিখুক, আসে যায় না। "এ কথা বল্‌বো না যে পরবর্ত্তীদের কাছ থেকে আরো ভালো কিছু চাই, বলবো অন্য কিছু চাই।"

এ হেন পথিক অমিত রায় শিলঙের শ্যামল ছায়ায় লাবণ্যকে দেখ্‌লে। চোখ তা'র বুজে এলো আবেশে, সে কিছু দিনের জন্যে বস্‌তে চাইলে।

"চল্‌তে শিখ্‌তেই মানুষের দেরী হয়। আমার হ'লো উল্‌টো, এতোদিন পরে এখানে এসে বস্‌তে শিখেছি।"

অমিত বাঁধা পড়লো, কিন্তু ঐ বদ্ধ অবস্থাতেও ভুল্‌তে পার্‌লে না যে তা'রা পথিক, তাদের এ মিলন নিতান্তই হঠাৎ। সে গাইলে পথের গান:

"পথ বেঁধে দিলো বন্ধনহীন গ্রন্থী
আমরা দু'জন চল্‌তি হাওয়ার পন্থী।"

লাবণ্য এই পথিককে চিনেছিলো তাই তাকে বেঁধে রাখতে চায়নি, তা'র স্বপ্নের মধ্যে যতটুকু মিশিয়ে থাক্‌তে পারে সেই তা'র লাভ। নদীর স্রোতকে বেঁধে রাখ্‌লে সে সরোবর হ'য়ে পড়ে—সেতো তা'র মরে যাওয়া।

এদিকে অমিত বাসা তৈরী করে' বধূকে আহ্বান কর্‌লে। শঙ্কিত হৃদয়ে নববধূ এলো। তা'র বুকে বুক রেখে পথিক ছাদের উপর দখিণা হাওয়ার স্বপ্ন দেখ্‌লে, গঙ্গার দু'তীরে তা'দের দু'খানি বাড়ী "দীপক" আর "মানসীর" অস্তিত্ব কল্পনায় অনুভব ক'রে কদম ফুলের মত হর্ষকণ্টকিত হ'তে লাগ্‌লো। নববধূ কিন্তু অমিতর বুকে শুয়ে বল্‌লে তোমাকে আমি আট্‌কে রাখ্‌ব না, তুমি তো গৃহ-বাঁধবার লোক নও। লাবণ্যর কথায় তা'র ভুলে যাওয়া পথের কথা স্মরণ হলো। সে লাবণ্যর হাত ধরে' বল্‌লে।

"তোমার নাম সার্থক হোঁক, বন্যা, তুমি আমাকে বদ্ধ ঘর থেকে বের করে' পথে ভাসিয়ে দিয়ে চল্‌লে বুঝি। ঘরের মধ্যে নানান্ লোক, পথ কেবল দু'জনের।"

একদিনের বাসর রাত্রি মিলিয়ে গেল। লাবণ্যর হাত ধরে' অমিত বাসর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, আর সেখানে প্রবেশ কর্‌লে না। এমন সময় শোভন্‌লালের চিঠি পেয়ে সেও মেতে উঠলো, পথের পুঁথির সন্ধানে বেরুবে। যাবার সময় লাবণ্যকে বল্‌লে,

"বন্ধু! চিরকাল ধরে' আমাদের সপ্তপদী গমন হ'বে।"

—o—

একদিন লেগেছে যা ভালো

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

একদিন স্তব্ধ এক নিদ্রাহীন রাত
এসেছিল মোর ভাগ্যে—;
করি দৃষ্টিপাত
দেখেছিনু একরাতে অতীতের সব চিত্রগুলি।
যে দিনগুলিরে এনু দুই পায়ে দলি
ভবিষ্যতে চাহি শুধু; আজি বর্ত্তমান
হ'ল সেই দান।

অতন্দ্র নয়নে চাহি' ছিল শুধু একটি তারকা
মোর মুক্ত বাতায়ন-পথে তা'রে গিয়াছিল দেখা
অনন্ত সে নীলাকাশ—,
দেখি নাই কিছু।
ওই ক্ষুদ্র তারকার পিছু
ছিল লুকাইয়া মোর অতীতের সব ইতিহাস।
কতদিন, কত রাত্রি, দীর্ঘ বর্ষ মাস
একে একে কেটে গেছে
আজ তার হিসাব নিকাশে
মন নাহি সাড়া দেয়,—বলে
"থাক—থাক, হবে চিরশেষে।"
কি করেছি দীর্ঘকাল ধরে' ভাবি তাই,
কোথা আমি আসিয়াছি
আজ তাহা কাহারে সুধাই,—?
কেই বা উত্তর দিবে?
শুধু জাগে অতীতের ছবি
ডুবে গেছে সে কখন অস্তাচলে রবি;
তাহারই রক্তিম আলো জেগে ওঠে যেন ধীরে ধীরে
চাহিলাম ফিরে
বাতায়ন ছাড়ি—একি! ঘোর অন্ধকার
আলো নাই, শব্দ নাই, শুধু নীরবতা,
সীমা কোথা তার।
মনে পড়ে—
এসেছিল এমনই নিদ্রাহীন রাতি
সেদিনও আমার ঘরে জলে নাই বাতি
দেয় নাই দিকে দিকে আলোক ছড়ায়ে
শুভ্র জ্যোছনার ধারা পড়েছে গড়ায়ে
সুনীল আকাশ হ'তে;
মোর সেই বাতায়ন পথে
এসে পড়েছিল মোর শয্যার উপরে।

কোথা হতে
বাঁশী বেজেছিল; সেই নিস্তব্ধ নিশায়
বাঁশরীর গানে কত কথা সে জানায়।
কোথা কোনখানে
গেয়েছে পাপিয়া, ধরা মুগ্ধ তা'র গানে
হয়েছিল সেইদিন; তারই সেই সুর
নিকটেতে এনেছিল দূর।

থাক পুরাতন কথা;
আজ কাজ নাই
আজিকে দশমী রাতি,
কালি যে নবমী গেছে তাই
শুভ্র আলো প'শেছিল বাতায়ন দিয়া
ঘরে; যবে চেয়েছিনু—
অতীতের স্মৃতিগুলি
জেগে উঠে ভরেছিল হিয়া।
আজিকে দিনের বেলা, বর্ত্তমান হ'ল আগুয়ান
কাজ—শুধু কাজ কর,
"সময়ের সার বর্ত্তমান"
এই কথা মনে জাগে,
কোথা চাঁদ, কোথা তার আলো?
কোথা সে বাঁশীর গান
এ দিন তন্দ্রাচ্ছন্ন শয্যাপরে লেগেছে যা ভালো?

বর্ত্তমান—বর্ত্তমানই,
একছন্দে, একই সুরে গাঁথা,
একই ফুলে গাঁথা মালা;
দূরের আসন আছে পাতা
মনের অতল তলে; অনাগত কে আসিবে বলে'
দেখিবার অবকাশ কোথা?
কাল চলে
উচ্ছ্বসিত জলস্রোত মত।
ভুলিয়া তো যাই নাই, কাল যে অতীত
মূর্ত্ত হ'য়ে এসেছিল। দূর ভবিষ্যৎ
এসেছিল কাছে মোর; তাই কালরাতি
ভবিষ্যৎ-স্বপ্নে ভরা হৃদয়ে আমার
জ্বেলেছিল বাতি।

বীমা-প্রসঙ্গ

প্রত্যর্পণ-মূল্য বা সারেণ্ডার ভ্যালু কম হয় কেন ?

শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়

বীমাকারী সাধারণতঃ বীমা-পলিসি সংক্রান্ত বিষয়ে মাথা ঘামান না এবং বীমা বিষয়ে কোনও প্রকার খোঁজ লন না। কাজেই যখন পলিসি কোম্পানিকে ফেরত দিয়া সারেণ্ডার ভ্যালু চাহেন তখন উহার অঙ্কটি দেখিয়া চটিয়া যান ও মনে করেন যে বীমা কোম্পানি তাঁহার টাকাগুলি অযথা আত্মসাৎ করিল। তিনি বাঁচিয়া আছেন ও কয় বৎসর প্রিমিয়ম চালাইয়া গিয়াছেন অতএব কোম্পানির উচিত তাঁহার টাকা তাঁহাকে ফেরত দেওয়া। এইরূপ মনোভাবই বীমাকারীর হইয়া থাকে।

বীমাকারীগণ সাধারণতঃ জানেনই না যে বীমা এক চুক্তি বিশেষ। পলিসিখানা সেই চুক্তির রেজেষ্ট্রীকৃত দলিল। এই চুক্তি বা কণ্ট্রাক্ট অনুসারে তিনি প্রতি কিস্তিতে টাকা দিতে বাধ্য এবং তিনি যতদিন চাঁদা দিবেন ততদিন কোম্পানীও পলিসিলিখিত সর্ত্ত পালন করিতে বাধ্য।

সাধারণতঃ আইনতঃ যে চুক্তিতে লোকে আবদ্ধ হয় সে চুক্তি উভয় পক্ষের কেহ ভাঙ্গিতে পারে না। যদি কোনও পক্ষ চুক্তিভঙ্গ করে তবে সেই পক্ষ অন্য পক্ষকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। বীমার ক্ষেত্রে কিন্তু বীমাকারী এ সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশী সুবিধা ভোগ করেন।

একবার পলিসি বাহির করিয়া দিবার পর কোনও কোম্পানি একথা বলিতে পারে না যে সে চুক্তির সর্ত্ত রক্ষা করিতে অক্ষম অতএব বীমাকারীর টাকা আর সে লইবে না। কিন্তু বীমাকারী যে কোনও সময়ে বলিতে পারেন যে তিনি আর বীমার টাকা চালাইবেন না। অর্থাৎ তিনি যে কোনও সময় চুক্তিভঙ্গ করিতে পারেন এবং তজ্জন্য ক্ষতিপূরণতো তাঁহাকে দিতেই হয় না বরং তিনি আবার অপর পক্ষকে ক্ষতি স্বীকার করিতে বাধ্য করান। অর্থাৎ কোম্পানির নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া কোম্পানিকে ক্ষতি স্বীকার করিতে বাধ্য করান।

এই জন্য পূর্ব্বে প্রত্যর্পণ-মূল্য দেওয়া হইত না। কিন্তু যখন বীমা-কোম্পানির সংখ্যা বাড়িতে লাগিল তখন প্রতিযোগিতায় কোম্পানিরা বীমাকারীকে অপর কোম্পানি অপেক্ষা কি সুবিধা দিবে ইহারই অন্বেষণে প্রত্যর্পণ-মূল্যের আবশ্যকতা আবিষ্কার করিল।

ইংলণ্ডের অ্যাকচুয়ারী সমিতি পূর্ব্বে প্রত্যর্পণ-মূল্যের আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দেই উক্ত সমিতিতে আলোচনার ফলে বিবেচিত হয় যে প্রত্যর্পণ-মূল্য দেওয়া চলে তবে তখন ইহাও স্বীকৃত হয় যে বীমাকারীর প্রত্যার্পণ-মূল্য সম্বন্ধে কোনও হক্ (রাইট) নাই।

কিন্তু এখন আর বলা চলে না যে প্রত্যর্পণ-মূল্যে বীমাকারির কোনও দাবী নাই। কোম্পানিরা স্বয়ং তাঁহাদের বিবরণী পুস্তিকায় প্রত্যর্পণ-মূল্য দিতে স্বীকৃত হন এবং আইন অনুসারে তাঁহাদের যে হিসাব সরকারের নিকট পেশ করিতে হয় তাহাতে প্রত্যর্পণ-মূল্যের পরিমাণ উল্লেখ করিতে হয়। অতএব এখন তাঁহারা আইনতঃও ইহা দিতে বাধ্য।

সাধারণ বীমাকারী জানেন না যে তাঁহাকে বীমা করাইবার জন্য কোম্পানির কত টাকা খরচ হয়। প্রায়শঃ প্রথম বৎসরের চাঁদার সমস্ত টাকাটাই এজেন্টের কমিশন, ডাক্তারের ফি, অ্যাটর্ণির ফি, সরকারি ষ্ট্যাম্প ইত্যাদি বাবদ খরচ হইয়া যায়। অবশ্য চাঁদার মধ্যে এই টাকাটা ধরা

থাকে কিন্তু সেটা এমন ভাবে ধরা থাকে যে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সম্পূর্ণ সময়টায় পলিসিখানি বহাল থাকিলে প্রতিবৎসরই কিছু কিছু করিয়া খরচাটা ফেরৎ পাওয়া যায়।

অতএব যদি মেয়াদের মাঝখানে কেহ প্রত্যর্পণ-মূল্য চাহিয়া বসেন তবে কোম্পানি যে টাকাটা খরচ করিয়া বসিয়া আছে সেটা না কাটিয়া রাখিয়া চাঁদার টাকা বীমাকারিকে ফেরত দিতে পারে না।

ইংলণ্ডের অ্যাকচুয়ারী সমিতি (Institute of Actuaries) এ সম্বন্ধে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে অভিমত ব্যক্ত করেন। ঐ বৎসর স্থিরীকৃত হয় যে, "প্রত্যেক পলিসি বাবদ যে রিজার্ভ বা আমানত জমা বছর বছর গড়িয়া উঠে তদ্বারাই প্রত্যর্পণ মূল্যের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইবে।" কিন্তু প্রত্যর্পণ-মূল্য ঠিক করিবার সময় নিম্নলিখিত দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১। সুস্থকায় ব্যক্তিরাই প্রত্যর্পণ-মূল্য চাহিয়া থাকেন। ক্ষীণ-স্বাস্থ্য ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ অপারগ ক্ষেত্রেও বীমার চাঁদা চালাইয়া যান ইহার ফলে মৃত্যুহারের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা হয়।

২। বীমা সংগ্রহ করিতে গোড়ায় যে খরচ হয় ও পলিসিটী যতদিন বহাল থাকে ততদিন কোম্পানীর যে খরচ হয় সে খরচ ফেরত পাইবার অধিকার কোম্পানীর আছে।

এই কারণেই প্রথম বৎসরে কোনও কোম্পানিই প্রত্যর্পণ মূল্য দিতে পারেন না। আজকাল কোম্পানীরা সাধারণতঃ তিন বৎসর পলিসি বহাল না থাকিলে প্রত্যর্পণ-মূল্য দেন না। কেহ কেহ দুই বৎসর পূর্ণ হইলেই দিয়া থাকেন। কিন্তু প্রত্যর্পণ-মূল্য কষিবার সময় প্রথম বৎসরের চাঁদাটা হিসাব হইতে একেবারেই বাদ দেওয়া হয়।

এই নিবন্ধটী নিতান্ত সাধারণ পাঠকের জন্য এবং যে সকল এজেন্ট এসকল বিষয়ে আলোচনা করেন নাই তাঁহাদের জন্য লিখিলাম। কাজেই একটা জটিল বিষয়কে সরল ভাবে বলিতে গেলে যে অনেক কথা বাদ পড়িয়া যায় তাহা মনে রাখিয়া বিশেষজ্ঞ যেন অসহিষ্ণু না হইয়া পড়েন। আমার উদ্দেশ্য বীমাকারীকে বুঝান যে প্রদত্ত চাঁদা অপেক্ষা প্রত্যর্পণ-মূল্য কম হইল বলিয়া তিনি যেন কোম্পানীর উপর চটিয়া না যান এবং বীমার উপর বীতশ্রদ্ধ না হন। আমি এরূপ দু'একজন লোক দেখিয়াছি বলিয়াই এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

উপরে যে পলিসি রিজার্ভ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছি তাহা কি সে বিষয় কিছু বলিলে প্রত্যর্পণ-মূল্য কেন কম হয় তাহা স্পষ্টতর হয়। কিন্তু ঐ বিষয়ের এখানে অবতারণা করিলে প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ ও অনেকটা অবান্তর হইয়া পড়িবে। এবিষয়ে ভবিষ্যতে আলোচনা করা যাইবে। তবে প্রথম বৎসরের টাকাটা কেন কোম্পানি একেবারেই প্রত্যর্পণ-মূল্য কষিবার সময় বাদ দেয় তাহা বুঝাইবার জন্য একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিতেছি।

ধরুন দশজন লোক আসিয়া আমাকে বলিল,—"আমরা যদি আগামী দশ বছরের মধ্যে মারা যাই তবে প্রত্যেকের পরিবারকে তুমি ১০০০৲ এক হাজার টাকা দিবে। যদি বাঁচিয়া থাকি কিছু দিবে না। আমাদের নিকট বাৎসরিক কত টাকা চাও?" পাঠক দেখিবেন যে বীমা কোম্পানি অপেক্ষা সর্ত্ত সহজ কেননা দশ বৎসর পরে টাকা ফেরৎ দিতে হইতেছে না। আমাকে দেখিতে হইবে বৎসরে কয়জনের মৃত্যু হইবে। ধরিয়া লওয়া যাক্ যে মৃত্যুহারের তালিকা অনুসারে বৎসরে একজন করিয়া মারা যাইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে প্রথম বৎসরে দশ জন চাঁদা দিবে, দ্বিতীয় বৎসরে ৯ জন চাঁদা দিবে, তৃতীয় বৎসরে ৮ জন চাঁদা দিবে —এইরূপে দশ বৎসরে মোট চাঁদা পাওয়া যাইবে— ১০+৯+৮.....+১=৫৫। দশ বৎসরে আমার দায়িত্বের পরিমাণ দশ হাজার টাকা। ১০,০০০কে ৫৫ দিয়া ভাগ দিলেই বাৎসরিক চাঁদার হার পাওয়া যাইবে। এই ভাগের ফলে পাওয়া যায় ১৮২৸৵০ কিন্তু হিসাবের সুবিধার জন্য আমরা ১৮৩৲ বাৎসরিক চাঁদা ধরিয়া লইলাম। তাহা হইলে প্রথম বৎসরে মোট আদায় হইল ১৮৩০৲। প্রথম বৎসরেই একজন মারা গেল; তাহাতে দিতে হইল এক হাজার। আমার হাতে রহিল ৮৩০৲। এখন যদি বাকী নয়জন আসিয়া বলে—"আমরা চুক্তির মধ্যে থাকিতে চাই না—আমাদের যাহা পাওনা

হয় দাও।" তাহা হইলে তাহাদিগকে ৮৩০৲ টাকাই ভাগ করিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে প্রত্যেকের ভাগে ৯১৲ টাকা পড়িবে। চুক্তিকারীরা যাহা দিয়াছিল তাহার অনেক কম। এই ব্যাপারটা যদি কোনও কোম্পানির হইত তবে কোম্পানি এই ৯১৲ টাকাও দিতে পারিত না। কেন না প্রথম বছর যে ১৮৩০৲ আয় হইল তাহা আনয়ন করিতে খরচ হয়তো ১৮০০৲ হইত। তদুপরি মৃত্যুর জন্য যদি ১০০০৲ দিতে হয় তবে ১৮০০৲ খরচ দাঁড়াইত। অর্থাৎ আয় অপেক্ষা ব্যয় হইল বেশী। কাজেই প্রথম বৎসরের চাঁদা হইতে কোনও অংশই প্রত্যর্পণ-মূল্য বাবদ কোম্পানি দিতে পারে না।

(উপাসনা)

প্রভাত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড্।

প্রভাত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী ১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে বোম্বাই-এ স্থাপিত হয়। স্থাপিত হইবার ১ বৎসর পরে ইহারা গভর্ণমেণ্ট সিকিওরিটি জমা দিয়া ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে কাজ আরম্ভ করেন। প্রথম বৎসরে ৬৮৯ খানা বীমার প্রস্তাবে ১১,৫০,০০০৲ হাজার টাকার কাজ পান এবং ৭,৮৬,০৪০৲ টাকার বীমাপত্র বাহির করেন। প্রথম বৎসরে কোম্পানী প্রিমিয়াম বাবদ ৪১,৫৭৯৲ টাকা পাইয়াছেন। প্রথম বৎসরে কোন প্রকার মৃত্যুজনিত দাবি উপস্থিত হয় নাই। কোম্পানীর মঙ্গলের জন্য কোম্পানীর সেক্রেটারী ও ম্যানেজারগণ এ যাবৎ কোন প্রকার পারিশ্রমিক দাবি করেন নাই এবং ডিরেক্টররাও কোন প্রকার ফিস্ গ্রহণ করেন নাই। প্রভাত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী বীমাকারীকে সকল প্রকার সুবিধা প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাদের প্রিমিয়ামের হার অত্যন্ত কম। ইহাদের বীমাপত্র সহজে বাতিল হয় না—কোম্পানী হইতে আপনা-আপনি বীমাপত্র চালাইবার ব্যবস্থা আছে। কোন কারণে অক্ষম হইলে আর প্রিমিয়াম দিতে হয় না অথচ কোম্পানী বীমার সম্পূর্ণ টাকা প্রদান করে। দুই বৎসর প্রিমিয়াম দিবার পর বীমাকারী কোম্পানী হইতে টাকা কর্জ্জ পাইয়া থাকেন। ইহাদের নানাপ্রকার লাভজনক পলিসি আছে। মহিলাদের বীমাপত্র ইঁহারা গ্রহণ করেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত ধনকুবের ও মণিকার মিঃ ডি, সি, এইচ, দিনশা এই কোম্পানীর পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ দিনশা ব্যবসায়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এবং তাহার সুপরিচালনার ফলে কোম্পানী দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। গত অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত কোম্পানী ১৭,১৩,০০০৲ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমান অর্থ-সমস্যার দিনেও কোম্পানীর কাজ আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, বাংলা দেশে কোম্পানীর শাখার কাজ সুন্দররূপে পরিচালনার জন্য মিঃ দিনশা সুপরিচিত বীমাবিদ্ মিঃ বি, বি, দত্তকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়াছেন। মিঃ দত্তের বীমা বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে ও তাহার পড়াশুনাও কম নহে। তিনি বীমা বিষয়ক অনেক কাগজে অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়া প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছেন। মিঃ দত্ত বাংলা দেশের কাজ সুচারুরূপে চালাইবার জন্য একটি লোকেল বোর্ড অব্ ডিরেক্টারস্ গঠন করিতেছেন। আমরা আশা করি মিঃ দত্তের চেষ্টা সফল হইবে ও প্রভাত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী বাংলা দেশে জনপ্রিয় হইয়া উঠিবে।

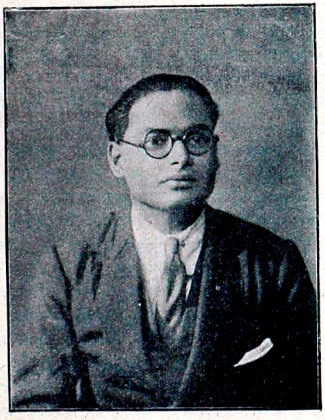

মিঃ বি, বি, দত্ত

টিপ্পনী

[অর্জ্জুন]

মেসার্স এণ্টারপ্রাইজিং এজেন্সী লাহোরের "ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর" কলিকাতার চীফ এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। "ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া" অনেক কোম্পানীর পক্ষে আদর্শস্বরূপ, "গ্রেট ইণ্ডিয়া"র মত কোম্পানী ইহার নিকট অনেক বিষয় শিখিতে পারেন।—আমরা এই কোম্পানীর সাফল্য কামনা করি।

স্বর্গীয় দেশনায়ক ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত সমরেশ চক্রবর্ত্তী "লাইট অব্ এসিয়া" ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে যোগদান করিয়াছেন। তাহার উৎসাহ, চেষ্টা ও অভিজ্ঞতার ফলে "লাইট অব এসিয়া" আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলে আমরা সুখী হইব।

শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র বসু "ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর" ১৭২১৬ নং পলিশীর মালিক। তিনি আজীবনের মেয়াদে

(whole life assurance) বীমা করিয়াছিলেন এবং আপাততঃ চাঁদা দিতে অক্ষম বলিয়া পেড্ আপ্ (paid up) পলিশির জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। উত্তরে কোম্পানীর কলিকাতার ম্যানেজার প্রবল বীমাবিদ্ মিষ্টার টি, এন, গুপ্ত তাহাকে লিখিয়াছেন, "In reply to your letter dated 25-9-31, we beg to inform you that the above policy being under a whole life table *can not* be converted into a paid up one *unless it is first converted into an endowment table or a whole life table with limited* payments।" জেনারেল এসেম্বলীজ্ কলেজের কৃতী ছাত্র গুপ্ত সাহেবের ইংরাজীর মুন্সিয়ানা অথবা বীমার জ্ঞান লইয়া আজ আলোচনা করিব না। কিন্তু ত্রিশ বৎসর বীমার ব্যবসায় পরিচালন করার পরও যে কোম্পানী এরূপ চিঠি লিখিতে পারে তাহাতে বীমা করার অর্থই যে বিপন্ন হওয়া তাহাও কি বলিয়া দিতে হইবে?

কিছুদিন পূর্ব্বে অনেক ডেপুটিরও দারোগা হওয়ার সাধ রহিয়া যাইত। সেইরূপ শ্রীযুক্ত জে,এম, সেনগুপ্তের দেখিতেছি কলিকাতার মেয়র ও দেশনায়ক হইয়াও বীমা কোম্পানীর ডাইরেক্টর হওয়ার সাধ মিটিল না। অথচ কিছুদিন পূর্ব্বে "বেঙ্গল মার্ক্যাণ্টাইল" নামক নির্জ্জীব কোম্পানীর ডাইরেকটরী করিতে গিয়া তিনি যে ভাবে বিপন্ন হইয়াছিলেন তাহা আমরা অবগত আছি। অথচ "ইষ্টার্ণ ন্যাশন্যাল" নামক যে নূতন কোম্পানীর তিনি ডাইরেকটর হইয়াছেন তাহাদের পরিচালকগণের কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা ঘোরতর সন্দেহ পোষণ করি। কোম্পানীর প্রস্পেক্টাসে লেখা আছে "মিষ্টার জে, এম, সেনগুপ্ত, Ex-President, All-India Congress." ইহার অর্থ কি? মিথ্যাভাষণের এই নমুনা কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিষ্টার এস, এন, ব্যানার্জ্জীর পক্ষে অস্বাভাবিক না হইতে পারে, কারণ, আমরা জানি, তিনি "বোম্বে মিউচুয়্যাল", 'ক্রিসেণ্ট' প্রভৃতি কোম্পানীর চীফ এজেন্সী করার সময় কি সব কীর্ত্তি করিয়াছিলেন—কেন "ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া" তাহার এজেন্সীর আবেদন গ্রাহ্য করেন নাই—সাময়িক পত্রে তাহার সম্বন্ধে অপ্রীতিকর আলোচনা সত্ত্বেও তিনি কোন প্রতিবাদ করেন নাই! আমরা জানি, so long as there are fools in this world, wise men will live. মিষ্টার ব্যানার্জ্জী wise man, তাহার অপ্রতিহত গতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না। কিন্তু প্রোফেসর—আবদর রহিম, তোমার জাতীয়তার বজরা কি অবশেষে জীবন-বীমার—"ইষ্টার্ণ ন্যাশন্যালের" কূলে পাড়ি জমাইবে?

বাঙ্গালা দেশে economic distryss কিরূপ প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে তাহার দুইটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে,—১ম, শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মেট্রপলিটান'এ এবং ২য়, শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষের "ইউনিক" এ যোগদান। অমর দা' গোড়া হইতেই অনেকটা 'কর্ম্মযোগীন্', যৌবনের আরম্ভে 'শ্রমজীবী সমবায়' স্থাপন করিয়া আজ পর্য্যন্ত নানা ব্যবসায়ই তিনি পরিচালন করিয়াছেন—এমন কি আসামে আত্মগোপন করিয়া থাকার সময়েও মুদীর দোকান করিয়াছিলেন। সুতরাং অমরদা' জীবন-বীমার দালালী আরম্ভ করায় আমরা তত আশ্চর্য্য হই নাই, যত আশ্চর্য্য হইয়াছি বোমাড়ে বারীন্দ্রকুমারের 'ইউনিক'এ যোগদান ব্যাপারে। বারীন্দ্রকুমার শুধু বীমার দালালি আরম্ভ করেন নাই, বীমার expert হইয়াছেন এবং আবিষ্কার করিয়াছেন যে, কোম্পানীর কাগজের দাম কমিয়া যাওয়ায় "ওরিয়েন্ট্যালে"র অনেক ক্ষতি হইয়াছে! বারীন্দা' কি বলিতে চান কোম্পানীর কাগজ না কিনিয়া বীমা কোম্পানীগুলি অতঃপর 'ভারত' ও 'হিন্দুস্থান'এর মত investment এর নাম করিয়া টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলিবে? কোন কর্ সাহেবের ইহাতে উপকার হইতে পারে, মল্টিভিয়েট টী ষ্টেটের উপর রাজপুরী নির্ম্মিত হইতে পারে, বহু বন্ধুবান্ধবের হিতসাধন হইতে পারে, পঞ্চনদে শিল্প-প্রতিষ্ঠার নাম করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠার অবকাশ হইতে পারে—কিন্তু নিরন্ন বিধবার ও দরিদ্র বীমাকারীর ইহাতে কি সর্ব্বনাশ হইবে ও হইতেছে, তিনি তাহা জানেন কি?

Printed by Baidyanath Biswas at The Sreekrishna Printing Works, 259, Upper Chitpore Road, and published by him from the 'Swadesh Office' 309, Bowbazar Street. Calcutta.

দি প্রভাত ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড।

আমাদের এই স্বদেশী কোম্পানীতে জীবন-বীমা করিয়া আপনার পরিবার-বর্গের মঙ্গলের সহিত দেশের কল্যাণ করুন। আমরা বীমাকারীকে সকল প্রকার সুবিধা প্রদান করিয়া থাকি। আমাদের পলিসি সহজে বাতিল হয় না, কোন কারণে অক্ষম হইলেও আর প্রিমিয়াম দিতে হয় না, অথচ বীমার টাকা আমরা দিয়া থাকি। বীমার হার অত্যন্ত সুলভ। মহিলাদের জীবন-বীমা গ্রহণ করা হয়। আমাদের এজেন্সী গ্রহণ করিলে আপনি লাভবান হইবেন।

অদ্যই বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন—

২ নং মিশন রো,
কলিকাতা।

বি, বি, দত্ত
ম্যানেজার।

দি ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া
ইন্সিওরেন্স্ কোং লিমিটেড্
লাহোর

পৃষ্ঠপোষক :—কর্পূরতলাধিপতি মহারাজা স্যার জগৎসিংহ, বাহাদুর, জি, সি, এস্, আই, জি, সি, আই, ই।

চেয়ারম্যান :—রাজা স্যার দলজিৎ সিং, সি, এস্, আই, কে, বি, ই।

বিশেষত্ব :—

১। কোন বীমাকারী রোগগ্রস্থ অথবা আকস্মিক কোন কারণে স্থায়ীরূপে বিকলাঙ্গ হইলে কোম্পানী তাঁহার সমস্ত প্রাপ্য টাকাই প্রদান করেন।
২। এই কোম্পানীতে সামান্য কোনও কারণে বীমা বাজেয়াপ্ত হয় না।
৩। অতি কম সুদে সর্ব্বনিম্নে ২৫৲ পর্য্যন্ত ধার দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া বীমাকারীগণ অনেক সুবিধা পাইয়া থাকেন।

এজেন্টগণকে নানা প্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

এই ঠিকানায় আবেদন করুন :—

এণ্টারপ্রাইজিং ইউনিয়ন
চিফ্ এজেন্ট
১নং হাজরা রোড, কলিকাতা।